সেই আদিম সন্ধান

সেই আদিম সন্ধান

চাণক্য সেন

পরিবেশক : বিশ্বজ্ঞান
৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯

সেই আদিম সন্ধান

॥ এক ॥

বসন্ত-বিহার।

নিউ দিল্লীর সবচেয়ে অভিজাত পল্লীর অন্যতম। আধুনিক স্থপতিশ্রী বাড়িগুলির মালিক কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চতম অফিসর, অথবা ধনী ব্যবসায়ী, ধনসম্পন্ন উঁচু-মানের ডাক্তার, ইনজিনীয়র অ্যাডভোকেট, চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট সম্পাদক কিংবা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ; এক কথায়, বর্তমান ভারতীয় সমাজের যাঁরা মধ্যমণি। এঁদের অনেকেই পুরো বাড়ি অথবা বাড়ির একাংশ ভাড়া দিয়ে থাকেন বিদেশী দূতাবাসসমূহের ডিপ্লোম্যাটদের অথবা বিদেশী-দেশী বড় বড় ব্যবসায়ী সংস্থার উচ্চতম পংক্তির এক্‌জিকিউটিভদের। পুরো বাড়ি ভাড়া বিশ থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা প্রতিমাসে। কোনও ফ্ল্যাটের ভাড়াই দশ হাজার টাকার কম নয়।

পল্লী নির্মাণের পরিকল্পনাটাও আধুনিক এবং আকর্ষণীয়। সব বাড়িগুলিই প্রশস্ত জমির ওপর তৈরি। পাঁচশ থেকে হাজার বর্গগজ এক একটা বাড়ির সীমানা। অতএব প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে রয়েছে ঘনসবুজ লন, রংবাহার ফুলের বাগান, কিছু কিছু ছায়াপ্রদ বড় বড় গাছ, গাড়ি রাখবার গ্যারেজ, চাকর-বাকরদের জন্যে আলাদা কোয়ার্টার্স, যদিও এদের অধিকাংশই অবিবাহিত একক পুরুষ বা নারী অথবা ছোট্ট পরিবারকে ভাড়া দেওয়া।

বলা বাহুল্য, সব বাড়ির আসবাবপত্রই আধুনিক এবং ধনবানের রুচির পরিচায়ক। কলর টেলিভিসন, ভি-সি-আর, সূক্ষ্ম-সুর মিউজিক সিস্টেম, এয়ারকন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটার, কুকিং রেঞ্জ, ওয়াসিং মেসিন: বিত্তবানদের আরামদায়ক জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুতেই অধিকাংশ বাড়ি সমৃদ্ধ। দামী আধুনিক সোফাসেট, মূল্যবান সুদর্শন কার্পেট, দেওয়ালে দেশী অথবা বিদেশী বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা এক বা একাধিক আসল ছবি, দেশ-বিদেশ থেকে সংগৃহীত ঘর সাজানর বিভিন্ন উপকরণ।

এবং প্রায় সব বাড়িতেই একটি বা দুটি গাড়ি।

ও অন্তত শ'খানেক বই।

পল্লীর দুই প্রান্তে দুটি প্রধান প্রবেশ পথ। পূর্বী মার্গ ও পশ্চিমী

মার্গ। মাঝখানে, পল্লীর বুক চিরে বসন্ত মার্গ। ভিতরের পথগুলির নাম সংখ্যাজ্ঞাপক। স্ট্রীট নম্বর এক, দুই, তিন। তারপর বাড়ির নম্বর। ৬ ৯ বসন্তবিহার মানে ৬নং রাস্তার ৯ নম্বর বাড়ি। বেশির ভাগ বাড়িই উঁচু দেওয়ালে ঘেরা। গেটের সামনে বাসিন্দার নাম। অনেক বাড়ি, বিশেষত যেগুলিতে বিদেশী ডিপ্লোম্যাট অথবা দেশী অতি-ধনীরা বাস করেন, প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত।

ষোল-নম্বর স্ট্রীটের এগার নম্বর বাড়ির গেটের সামনে বড় বড় অক্ষরে একখানা সাদা পাথরে খোদাই করা রয়েছে রাজীব মাথুর।

পাঁচশ বর্গগজের ওপর নাতিবৃহৎ বসত বাড়ি। নিচে ওপরে মিলে সাতখানা ঘর, প্রত্যেকটাই বেশ বড়, কোনওটাই প্রকাণ্ড নয়। বাড়ির সামনের লন তেমন সবুজ নয়, ফুলের বাগান তেমন রংবাহার নয়। ঘোরান-সিঁড়ি আউট-হাউসের দোতলায় থাকে বাড়ির বহু বছরের পুরান চাকর রামদাস তার স্ত্রী লছমীকে নিয়ে। একতলায় রাজীব মাথুরের ড্রাইভার, বাহাদুর সিং অধিকারী।

রাজীব মাথুর সুপ্রিম কোর্টের উঠতি অ্যাডভোকেট। কোর্টে আইন প্র্যাকটিস করা ছাড়াও অনেক বিষয়ের সঙ্গে তার সজীব সংযোগ 'কমন কজ' নামক প্রতিষ্ঠান, যা জনসাধারণের বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে অথবা হাই কোর্টে মামলা করে থাকে, তার অন্যতম সক্রিয় সদস্য রাজীব মাথুর। সম্প্রতি টেলিফোন নিয়ে জনসাধারণের অসংখ্য দুর্ভোগগুলিকে মামলার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে আর দুজন অ্যাডভোকেটের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রাজীব মাথুর নালিশ রেখেছে সুপ্রিম কোর্টে মহানগর টেলিফোন নিগমের বিরুদ্ধে। মামলার প্রথম ধাপে তাদের জয় হয়েছে। বিচারপতি মহাজন ও বিচারপতি রামানুজম মামলা গ্রহণ করেছেন, যদিও শুনানির দিন আসতে দু-চার বছর কেটে যাবে এটা সবাই জানে।

পাবলিক ইনটারেস্ট লিটিগেশনেও রাজীব মাথুর অগ্রগণ্য। জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্যে বেশ কয়েকবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সামনে মামলা লড়েছে রাজীব মাথুর, কয়েকবার জিততেও পেরেছে। কোর্ট বন্ধ থাকলে মামলা নিয়ে হাজির হয়েছে বিচারপতিদের বাসগৃহে, অনেক সময় জনস্বার্থের অনুকূলে রায় বার করে আনতে পেরেছে। হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকাদের বিনা বিচারে 'বিচারাধীন কয়েদী' করে বছরের পর বছর জেলে রেখে দেওয়ার প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে এ প্রথাকে বে-আইনী, সংবিধান-বিরোধী এবং এক্ষুনি বর্জনীয় 'রায়' বের করে এনেছে রাজীব মাথুর বিচারপতি ভার্গবের বেঞ্চ থেকে। এ সাফল্যের জন্যে তার

নামও বেশ হয়েছে। প্রথাটা কিন্তু বর্জিত হয় নি। আদালত শুধু আদেশ দিতে পারে, তার আদেশকে পালন করবার দায়িত্ব প্রশাসনের। প্রশাসনের চাকা চলতেই চায় না ; যদি বা চলে, অতি ধীরে। তথাপি, একটা বহুকালীন অন্যায়, জবর-জুলুম প্রথা, যার গায়ে ঔপনিবেশিক ও জমিদারী দুঃশাসনের পূতিগন্ধ, এবং যা স্বাধীন ভারতবর্ষে নির্বিবাদে পঁয়ত্রিশ বছর চলে এসেছে, তাকে অনেকখানি কমিয়ে আনবার সফল সমাজসচেতন প্রচেষ্টার [illegible]রাভাগে দেশের মানুষ যাদের দেখতে পেয়েছে তার মধ্যে একজনের [illegible] রাজীব মাথুর।

সিভিল লিবার্টিস্ য়ুনিয়নেরও অন্যতম অগ্রণী সদস্য রা[illegible]মাথুর। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শিখদে[illegible]দ্ধে যে ব্যাপক 'অভিযান' চালান হয়েছিল যার ফলে দু তিন হাজার মা[illegible]মৃত্যু, হাজার হাজার পরিবারের গৃহ-চ্যুতি ও কোটি কোটি টাকা মূল্যের ঘরবাড়ি গাড়ি আসবাবপত্রের বিধ্বংস, তার 'বে-সরকারী' অনুসন্ধানের জন্যে যে কমিটি তৈরী হয়েছিল তার সদস্য ছিল রাজীব মাথুর। সুপ্রিম কোর্টের এক ভূত-পূর্ব বিচারপতির নেতৃত্বে এই কমিটি চার মাস অনুসন্ধানের পরে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল দেশব্যাপী এক প্রবল বিতর্ক। কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের এক বিচারপতিকে নিয়ে একটি এনকোয়ারী কমিশন বসাতে। কমিশনের রিপোর্ট অবশ্য প্রকাশিত হয় নি, দুষ্কৃতকারীদের একজনকেও সাজা দেওয়া হয় নি। কিন্তু রাজীব মাথুর ও সিভিল লিবার্টিস্ য়ুনিয়নের জনপ্রিয়তা বেড়েছে, লন্ডনে অবস্থিত বিশ্ব-বিখ্যাত 'অ্যামনেস্টি ইনটারন্যাশনাল' রাজীব মাথুরদের অনুসন্ধানী কমিটির রিপোর্টের সারাংশ নিজেদের বুলেটিনে ছেপে দিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের উঠতি অ্যাডভোকেট রাজীব মাথুর সমাজসচেতন, সামাজিক দায়িত্ব-সম্পন্ন মাঝবয়সী প্রতিষ্ঠিত পুরুষ।

দেখতে মোটেই আকর্ষণীয় নয়। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি শরীর মেদাধিক্যে অনেকটা গোলাকৃতি। টাক মাথার মধ্যস্থল অধিকার করে নিয়েছে, তার চার পাশে যে হালকা চুলের বেড়া তার বর্ণ সাদা ও কালোর মাঝামাঝি এক ধরনের হলদেটে-তামাটে-লাল। প্রশস্ত কপালের নিচে প্রকাণ্ড দুটি চোখ, যাদের দৃষ্টি ঘোলাটে হলেও তীক্ষ্ণ এবং দূরগামী। নাক বড়, এবং মাঝখানে ভাঙা, নাকের নিচে পুরু সাদা-কালো গোঁফ। ভরা গাল দুটি প্রথম চিবুককে ভাগ করে নিয়েছে নিজেদের দখলে, গলার বাড়তি মাংস থেকে তৈরি হওয়া দ্বিতীয় চিবুকটাকেও আক্রমণ করে বসেছে। চুয়াল্লিশ ইঞ্চি ভুঁড়ি আর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ভার বহন করে চলাটা রাজীব মাথুরের পক্ষে অভ্যেস হয়ে গেলেও সহজ নয়।

পুরু কাচের চশমা চোখে। চারটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধান।

রাজীব মাথুরের সংসার বলতে বাষট্টি বছরের মা, তের বছরের মেয়ে, এবং রাজীব মাথুর।

স্ত্রী ললিতা মরে গেছে চার বছর।

রাজীব মাথুরের বয়স পঁয়তাল্লিশ। ললিতার মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল একচল্লিশ। ললিতার আটত্রিশ। আটত্রিশ বছর বয়সে ধনী পরিবারের গৃহিণী ললিতা মাথুরের মরে যাবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

যখন বিয়ে হয়েছিল তখন রাজীব মাথুরের বয়স ছিল ছাব্বিশ, ললিতার তেইশ। দুবছরের মধ্যে জন্মাল প্রথম সূর্যের মত একটি সোনালি কন্যা। ললিতা তার নাম রাখেন ভাস্বতী।

ললিতার যখন বয়স ত্রিশ, তখন ধরা পড়ল সে লিউকেমিয়ায় ভুগছে। রাজীব মাথুর অনেক চিকিৎসাপত্র করে তাকে আট বছর বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল। আটত্রিশ বছর পূর্ণ হবার চার দিন আগে ললিতা মরে গেল।

পিতা গোবিন্দকিশোর মাথুর স্বর্গলাভ করেছিলেন অনেক আগে, রাজীব তখন মাত্র আঠার বছরের যুবক। তিন পুরুষের লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা গোবিন্দকিশোরকে ধনী করে দিয়েছিল। বসন্তবিহারের জমি কেনা ও বাড়ি তৈরি তাঁরই কাজ। ললিতাকে বিয়ে করার পর বিধবা মা সত্যবতী বলেছিলেন, 'তোমরা বসন্তবিহারের বাড়িতে বাস করো, আমি থেকে যাই প্যাটেল নগরের বাড়িটাতেই!' রাজীব সে কথায় কান দেয় নি। প্যাটেল নগরের বাড়িটা মা বিক্রি করতে দেন নি; ওর আনাচে কানাচে গোবিন্দকিশোরের স্মৃতি। ওখানে বাস করে রাজীব মাথুরের একমাত্র বোন, কাদম্বিনী। গোবিন্দকিশোরের উইলে সত্যবতীর মৃত্যুর পর ওটা কাদম্বিনীরই প্রাপ্য। গোবিন্দকিশোর তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিকে পুত্র-কন্যার মধ্যে সমান ভাগ করে দিয়ে যান নি। কন্যাকে দিয়ে গেছেন ছ আনা, পুত্রকে দশ আনা। কন্যার বিবাহে তিনি পাঁচ লাখ টাকা যৌতুক দিয়েছিলেন।

ভাস্বতী বসন্তবিহারেই মডার্ন স্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্রী। ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে পড়ে মডার্ন স্কুলে। ভাস্বতীর ইচ্ছে আইন পড়ে বাবার মত সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করার।

সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করবার জন্যে ভৃত্য রামদাস, তার স্ত্রী লছমী। বাগান দেখবার জন্যে একটা মালী রাখা আছে, প্রতিদিন তার চার ঘণ্টা কাজ করার কথা, কিন্তু এক ঘণ্টার বেশি তাকে দেখা যায় না। তদারক করবার লোকের অভাব। রাজীব মাথুরের গাড়ি চালায় বাহাদুর সিং অধিকারী। আলমোড়া জেলার লোক, রাজীব মাথুরের কাজে যোগ দিয়েছিল আট বছর আগে, লেগেই রয়েছে, থাকবেও, কেন না মনিব হিসেবে রাজীব

মাথুর ভাল। স্ত্রী ও সন্তানেরা বাস করে পাহাড়ী গ্রামে, বছরে একমাস ছুটি বাহাদুর সিং-এর, তখন রাজীব মাথুর নিজেই গাড়ি চালিয়ে নেয়।

যে-দিন এ কাহিনীর শুরু, সে-দিনটার সঙ্গে অন্য দিনগুলির প্রথম তফাৎ তার তারিখটা। ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সাল ইতিহাসে এক ও অদ্বিতীয়; কোনওদিন তার পুনরাবৃত্তি হবে না। রাজীব মাথুর তার প্রভাতী এক ঘণ্টা পদচারণের সময় আরও একবার অনেক পুরোনো প্রশ্নে হোঁচট খেয়েছে: সময় কেবল এগিয়ে যায় কেন? কেন সে কখনও পিছোয় না? সিনেমার গল্পে ফ্ল্যাশব্যাক হয়ে থাকে অবিরাম, হয়ে থাকে মানুষের মনে ও মস্তিষ্কে: স্মৃতি হঠাৎ বর্তমানকে কান ধরে অতীতে নিয়ে যায়, অতীত তার সবটুকু প্রচ্ছন্ন রহস্য নিয়ে বর্তমানের ওপর ছড়িয়ে দেয় তার ঝটপটে ডানা। কিন্তু আমরা জানি, খুব কঠিনভাবেই জানি, সময় পিছিয়ে অতীতে চলে যাবে না একদিনের জন্যে, এক ঘণ্টা বা এক মিনিটের জন্যে।

প্রত্যেকটা দিন, অতএব, জীবনের এক একটি নতুন পাতা, চব্বিশ ঘণ্টা তার আয়ু, তার পরে তার নির্বাসন অতীতে, সে হয়ে-গেছে, আর-হবার-সে নয়। এই এক একটা চব্বিশ-ঘণ্টা-আয়ু দিনের মধ্যে দশ ঘণ্টা তো নির্ঘাৎ কেটে যায় বাসায় বা গাড়িতে, খাবার ঘরে, শয্যায়: অর্থাৎ কাজ-কাজে। আমাকে সবাই বলে, আমিও বলি, খুব কর্মব্যস্ত লোক, কিন্তু বারো ঘণ্টা রোজ কাজ করবার জন্যে পাবার কি উপায় আছে? লোকজন, বন্ধু-বান্ধব, এবং মন অন্তত দুটো ঘণ্টা তো কেড়ে নেবেই প্রতিদিন। তার ওপর যদি ভাস্বতী কোনও কারণে সময় দাবি করে, যা প্রায়ই থাকে মাঝে মাঝে, মাসে অন্তত দু-দিন, তাহলে তো আরও গেল তিন চার ঘণ্টা, কখনও বা এক একটা সারা বিকেল অথবা সন্ধ্যে কিংবা রাত্রির অনেকখানি!

'মা বেঁচে থাকতে তুমি এমনভাবে কাজের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে না,' এই তো সেদিন হঠাৎ বলে বসল ভাস্বতী। মাত্র তের বছর বয়সের মেয়ে, সে কি করে জানল কে কোথায় কেন কিভাবে কিসের মধ্যে লুকিয়ে আছে? যে-কোনও কেউ তো নয়। তার নিজের বাবা! যে লোকটা সবসময় কাজ করছে, যাকে অনেক লোক দিন রাত কাজ করতে দেখছে, সে সবার চোখে দৃষ্ট হয়েও লুকোতে চাইছে এবং পারছে, এ দৃষ্টি তের বছরের মেয়ে পেল কোথা থেকে?

'আমি লুকোচ্ছি না-কি?' ভাস্বতীকে প্রশ্ন করে রাজীব মাথুর। অসন্তুষ্ট হয়ে নয়, রাগ করে নয়। প্রশ্নটা তাকে খোঁচা মেরে ব্যথা দেয় নি, সূচ ফোটায় নি। কৌতূহলী করেছে।

'সবাই তো আমাকে সবসময় দেখতে পাচ্ছে!'

ভাস্বতী কথা-না-বাড়িয়ে তার বড় বড় কিশোরী চোখ দুটি রাখল রাজীব

মাথুরের চোখে। ওষ্ঠাধর যা বলল না, চোখ দুটি তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু গভীর নীরবতায় জানিয়ে দিল।

জানিয়ে দিল. বাবা, তুমি মস্ত বড় লোক হতে পার, সবাই তোমাকে যতই-না খাতির করুক. তুমি আমার বাবা, অতএব আমার ছেলের মত সরল। আমার কাছ থেকে লুকোবার ক্ষমতা নেই তোমার, কেন নেই তা জানো-কি? মনে পড়ছে না-কি? তুমিই আমাকে একদিন বলেছিলে, 'ভাস্বতী' তুই যখন আমার পানে তোর বড় বড় চোখ মেলে তাকাস. আমার মনে হয় তাকিয়ে রয়েছে তোর মা।'

সকালে এক ঘণ্টা পায়ে-হাঁটা, স্ফীতদেহ রাজীব মাথুরের পক্ষে সুস্থ থাকবার জন্যে ডাক্তারের মতে অবশ্য প্রয়োজনীয়। বেঁটে-মোটা হলেও এখনও পর্যন্ত রাজীব মাথুর সুস্থ-সবল; একটু আধটু সর্দি ফ্লু ছাড়া অসুখ বিসুখ তাকে কাবু করে নি। ঘুম থেকে ছটার আগে ওঠা সম্ভব হয় না, কেন না মধ্যরাত্রির আগে শুতে যাবার অভ্যেস চার বছর চলে গেছে। ললিতা বেঁচে থাকবার বছরগুলিতে এগারটার মধ্যে শোবার ঘরে চলে আসা প্রায় বাধ্যতা-মূলক ছিল; ললিতার শেষ দুটো বছরে রাত দশটার বেশি রাজীব কাজ করতে দেয় নি নিজেকে।

'এত দেরি করে শুতে যাও কেন: বাবা?' দশ বছরের কন্যা ভাস্বতী জানতে চেয়েছিল। না, জানতে চায় নি. এত দেরী করে শুতে-না-যাবার অনুরোধ জানিয়েছিল।

'অনেক কাজ করতে হয়, মা,' কৈফিয়ৎ দিয়েছিল রাজীব।

'আগে করতে হত না?' অনুরোধ-প্রশ্ন তখনও নিরস্ত হতে চায় নি।

'এখন কাজ অনেক বেড়ে গেছে,' বলেছিল রাজীব। যা বলে নি তা হল, এখন কাজ অনেক বাড়িয়ে নিয়েছি।

'মা নেই. তাই তুমি অত রাত পর্যন্ত কাজ কর,' ঘোষণা করেছিল দশ বছরের মেয়ে ভাস্বতী।

এবং তাকিয়ে রয়েছিল রাজীবের চোখে চোখ রেখে. সেই দুটি বড় বড় চোখ দিয়ে যাদের সঙ্গে ললিতার চোখের তফাৎ দেখতে পায নি রাজীব।

এক ঘণ্টা সময় সকালে দুটি বড় বড় পদক্ষেপে বেঁটে-মোটা শরীরটাকে রোজকার পরিচিত রাস্তা দিয়ে অভ্যস্ত লক্ষ্যে পেঁছে দেয়, সেখান থেকে বসন্ত-বিহারের নিজস্ব গৃহে ফিরিয়ে আনে। হৃৎপিণ্ডের প্রয়োজনীয় এক্সার-সাইজ হয়, পাকস্থলীর ও শরীরের মাংস-পেশীরও। পশ্চিমের কোনও দেশ হলে রাজীব মাথুর রোজ অন্তত দু মাইল 'জগ' করত। বসন্তবিহারের বিদেশী বাসিন্দাদের বেশিরভাগই 'জগ' করে। রাজীবের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে থাকে এক জার্মান মহিলা, তার একমাত্র সহবাসী আট বছরের

একটি মেয়ে। রাজীব যখন হাঁটতে বেরোয় তখন তিনি 'জগ' করে ঘরে ফেরেন। একই পথের পথিক হিসেবে দুজনের মামুলি পরিচয় আছে। দৌড়ান বন্ধ না করেই জার্মান মহিলা বলেন, 'গুড মর্নিং'; রাজীবও তাই বলে; দুজনের মুখের ওপর দিয়ে মুহূর্তের পাতলা হাসির ছোট্ট হাওয়া বয়ে যায়।

রাজীব জানে, মহিলার নাম সীতা। বানান করা হয় জার্মান নিয়মে—সি-আই-টি-এ। সীতা মা-স।

রাজীব জানে, সীতা মা-সের স্বামী নেই। যার সঙ্গে সহবাসে কন্যাটির জন্ম, তার সঙ্গে সীতা মা-সে'র বিবাহ হয় নি। পাঁচ বছর হল ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তিন বছর ধরে সীতা মা-স দিল্লীতে বসবাস করছে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে গবেষণা করার জন্যে। জবাহরলাল নেহরু য়ুনিভার-সিটি তাকে অতিথি-গবেষক হিসেবে গ্রহণ করেছে, টাকা পায়, কোনও মতে টেনে টুনে চলে যায় এমন পরিমাণের টাকা, একটি জার্মান ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে।

রাজীব জানে, সীতা মা-স প্রতি মাসে তার সীমিত ডয়েটশ্-মার্ক কালো বাজারে বিক্রী করে কিছু বেশি টাকা পাবার জন্যে। এক শিখ ব্যবসায়ী, কনট সার্কাসের শংকর মার্কেটে তার জুতোর দোকান প্রতি মাসের দশ তারিখে সীতা—মা-সের বাড়ি এসে টাকাটা দিয়ে যায়।

রাজীব জানে, সীতা মা-সের মেয়েটির নাম রমা। ভারতবর্ষকে ভালো-বাসে সীতা মা-স। এতাস্থ ভালোবাসতে চায়। তাই মেয়ের নাম রেখেছে রমা।

রাজীব আরও জানে, রমার বাবা, যার সঙ্গে সীতা মা-সের কোনওদিন বিয়ে হয় নি, প্রতি বছর দিল্লী এসে রমাকে দু-সপ্তাহের জন্যে কোথাও ছুটিতে নিয়ে যায়। বেশিরভাগ দক্ষিণ আমেরিকায়—পেরু, কিংবা ব্রাজিল অথবা মেক্সিকো। ভদ্রলোক দক্ষিণ আমেরিকান, মানে লাতিন আমেরিকান, আরজেনটাইন এ্যারলাইনসের পাইলট।

পায়ের গতির সঙ্গে মনের গতির মিল নেই, মিস নেই। দুটি পা পশ্চিমী মার্গ অতিক্রম করে, পালামের দিকে হাঁটতে হাঁটতে এক মাইল চলে যায়, তারপর ফিরে আসে ১৬।২১ বসন্ত বিহারে।

আর মন?

মন উড়ে বেড়ায় বর্তমান থেকে অতীতে, অতীত থেকে ভবিষ্যতে, ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমানে। একের পর এক পুরুষ নারী, বালক, বালিকা, শিশু মনের পর্দায় ঘুরে বেড়ায়। মন এক একটা সমস্যা'র সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে, কোর্টে মামলার জেরা বা সওয়ালের জাল বোনে, 'কমন কজ' ও 'পাবলিক ইনটারেস্ট' নিয়ে

কল্পনা করে। মন তর্ক করে, যুক্তি করে, আলাপ করে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে। মন কল্পনার লাগাম ছেড়ে জাগ্রত স্বপ্নের বিস্তীর্ণ সৈকতে ঘোড়-দৌড় করে।

মন শেক্সপীয়রের এরিয়েল।

মন জয়েসের ইউলিসিস।

মন ঃ আর-কতদূরে-নিয়ে-যাবে-মোরে-হে-সুন্দরী সোনার তরী।

মন প্রতি সকালের এক ঘণ্টার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া। দিগ্দিগন্তে বিজয় অভিযান।

মন, তুমি-অর্জুন!—তুমি অর্জুন!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দেবার সময় মনটা শরৎ সকালের ফিনফিনে মিহি ঠাণ্ডা রেশম হাওয়ার হাতবুলোনিতে হঠাৎ খুব খুশি হয়ে উঠেছিল। কবিতা-টবিতার ধার ধারে নি কোনওদিন, তথাপি রাজীব মাথুরের মন মাঝে মধ্যে অতসী ফুলের মত কোমল হয়ে ওঠে। এ দিনটার খুশি সকালেও তাই হয়েছিল। কয়েক পা চলবার সঙ্গে সঙ্গে মন নিয়ে গেল আইনজীবী রাজীব মাথুরকে বিচারপতি প্রকাশ ভার্গবের কোর্টে, যেখানে আজ তার মামলা করতে হবে। চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন বিচারপতি প্রকাশ ভার্গব, দীর্ঘ কৃশ দেহ, বরফের মত সাদা মাথা, কোটরাগত জ্বলজ্বলে চোখ পুরু কাচ চশমার আড়ালেও তীক্ষ্ণ! ঈগলের ঠোঁটের ধাঁচে নাকটা বেঁকে পড়েছে মুখের ওপর, কানের ওপর দু গুচ্ছ চুল সীলিং ফ্যানের হাওয়ায় ওড়ে। প্রকাশ ভার্গব যতখানি আইন জানেন ততখানিই জানেন কী করে তাঁর নিয়োগ-কর্তাদের খুশি রাখতে হয়। ভারতবর্ষের সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টের বিচার-পতিদের আজীবন বেঞ্চে আসীন থাকবার ব্যবস্থা যদি রাখা হত, প্রকাশ ভার্গব কোনওদিন বিচারপতি হতে পারতেন না। রাজীব মাথুরের আইনজ্ঞ মাথায় এ কথা উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ ও আমেরিকান বিচার পদ্ধতির সূক্ষ্ম প্রভেদ নিয়ে মন-মস্তিষ্কের মধ্যে একটা তর্ক বেধে গেল, যে তর্ক সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের মধ্যে প্রায়ই ঘটে থাকে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের পরে আর কোনও জীবন থাকতে দেওয়া উচিত নয়, দিলেই বিচারপতিরা নিজেদের স্বার্থের লোভে কঠিনতম নির-পেক্ষতার পথ থেকে বিচ্যুত হতেও বা পারেন। রাজীব মাথুরের মনের ওপর দিয়ে খেলে গেল বিচারপতি প্রকাশ ভার্গব কতগুলি এনকোয়ারি কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছেন এবং তিনি সরকার পক্ষের সমর্থনে কটা রিপোর্ট লিখেছেন। বিচারপতি প্রকাশ ভার্গবের কোর্টে রাজীব মাথুরের মত 'রাজনৈতিক' আইনজীবীরা খুব একটা সুবিধে করতে পারেন না যদি মামলায় বিশেষ কোনও রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকে যার সঙ্গে সরকার প্রতিপক্ষ

ভূমিকায় সংযুক্ত। তবে আমাদের সুবিধে হল সংবিধান সংক্রান্ত মামলা অথবা রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ মামলা একক বিচারপতির কোর্টে আসে না ; তিন বা পাঁচ বিচারপতির কোর্টে মামলা এলে প্রকাশ ভার্গবকে নিয়ে দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। তবু তো একদিন আমি বিচারপতি ভার্গবের কানের সীমানার মধ্যেই বলে ফেলেছিলাম, কোনও কোনও জাস্টিসরা বেশ ভালো করেই আমাদের বুঝিয়ে দেন যে বেঞ্চ থেকে অবসর নেবার পর তাঁরা কোনও রাজভবনে প্রবেশের পথ তৈরি করে রাখছেন। বিচারপতি প্রকাশ ভার্গবের কৃশ শরীরটাকে [illegible] কেটে বেরিয়ে এল 'জগ্'-করা জার্মান নারী সীতা মা-স। পরনে শর্ট ও আস্তিনহীন পাতলা গেঞ্জি, মাথায় লালচে চুলগুলিকে বেঁধে রেখেছে সবুজ রঙের একটা বড় রুমাল। জগ্-করতে করতেই সীতা মা-স বলল, 'গুড মর্নিং', রাজীব মাথুরও তৎক্ষণাৎ তার জবাব দিল গুড-মর্নিং বলে। এগিয়ে চলে গেল সীতা মা-স, আর রাজীবের মনের পর্দায় এসে দাঁড়াল ললিতা, সীতা মা-স বিষয়ে টুকরো টুকরো খবর যার কাছ থেকে পেয়েছিল রাজীব। মনে পড়ল, ললিতা প্রথম প্রথম একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল সীতা মা-সের সঙ্গে আলাপের পর। ডাক্তাররা ললিতাকে সন্ধ্যের আগে বাড়ির সামনে রাস্তায় কিছুক্ষণ পায়চারি করতে বলেছিলেন। রাজীব মাথুরের কোর্ট থেকে ফিরতে সন্ধ্যে পেরিয়ে যেত। মক্কেলদের সঙ্গে সে সুপ্রিম কোর্টে নিজের অফিসেই দেখা করত, বাড়িতে বড় একটা আসতে দিত না কাউকে বিশেষ জরুরি প্রয়োজন না পড়লে। এক সন্ধ্যেবেলা বাড়ির সামনে ললিতা ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; রাস্তার ওপাশের বাড়িটার গেট খুলে এগিয়ে এল সীতা মা-স। দুজনের আলাপ পরিচয় হল। তার বিবরণ দিতে গিয়ে ললিতা রাজীবকে বলেছিল, 'জানো, ঐ সীতা মা-স কুমারী মা !'

রাজীব বিস্ময়ের ভঙ্গি করে বলেছিল, 'তার মানে ? ভার্জিন মাদার ?'

ললিতার পাংশু মুখখানাও সরস রক্তাভ হয়ে উঠেছিল।

'না, অ্যাডভোকেট মশাই,' ললিতা বলেছিল, 'তার চেয়েও খারাপ। বিয়ে না করেই মা হয়েছিল, লোকটা একদিন কেটে পড়ল, তারপর থেকে মেয়েকে নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে।'

রাজীব বলেছিল, 'তুমি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে কাহিনীটাকে জানাচ্ছ। ওদের দেশে অবিবাহিত মাতৃত্ব সম্পূর্ণ লিগ্যাল, এবং বিয়ে-না-হওয়া মাদের সংখ্যা অনেক !'

'কি বলছ ! এটাতো ভীষণ খারাপ !'

'কিন্তু সন্তানদের পরিচয় ? তারা কার নামে পরিচিত হয় স্কুলে, সমাজে।'

'কেন ? মার পদবী নেয়। বাপের পদবীটা না-হলেও ওদের বেশ চলে যায়।'

সীতা মা-স-ই ললিতাকে বলেছিল, মেয়ের বাবা প্রতি বছর দু-সপ্তাহের জন্যে মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যায়। নিজে দিল্লী এসেই নিয়ে যায়।

'আচ্ছা? একটা প্রশ্ন করব?' ললিতার বিব্রত কণ্ঠস্বরে রাজীব বেশ মজা পেয়েছিল।

'প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। আমি জানি তোমার মুখে কোন প্রশ্নটা ঝুলছে। জবাব দিচ্ছি। মেয়ের বাপের সঙ্গে সীতা মা-সে'র সম্পর্কটা তোমাকে কৌতূহলী করছে।'

'কি করে বুঝলে?'

'আমি তো অ্যাডভোকেট! সাক্ষীর মুখের পানে তাকিয়েই তার মনের কথা টের পেয়ে যাই।'

'ভদ্রলোক দিল্লীতে এসে ওর সঙ্গেই থাকেন।'

'তার মানে এ-নয় যে ওদের সম্পর্কের কিছু আর অবশিষ্ট আছে। ভদ্রলোক নিশ্চয় শুধু সীতা মা-সে'র মেয়ের বাবা, ভূতপূর্ব প্রেমিক ও বন্ধু, তার চেয়ে কিছু নয়।'

'তার মানে ওদের মধ্যে—'

'কিছু ঘটে না।'

সকাল বেলার এক ঘণ্টা ভ্রমণের অনেকটা সময় এখনও, মৃত্যুর এই চার বছর পরেও, ললিতা দখল করে রাখে। অনেক ঘটনা মনে পড়ে রাজীব মাথুরের, অনেক চলচিত্র স্মৃতির পর্দায় ছড়িয়ে পড়ে। এমন একটা সকালও যায় না যখন ভ্রমণের সময় ললিতার মৃত্যুর দৃশ্যটা রাজীব মাথুরের চোখের সামনে ভেসে না ওঠে। ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে এখনও রাজীবের হৃৎপিণ্ড কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায়, দেহটা অবশ হয়ে আসে। চোখের পলকে সে মুহূর্তগুলি কেটে যায়, পদক্ষেপ ক্ষান্ত হয় না, দেহটা চলে এগিয়ে, শুধু মন পেছনে পড়ে থাকে নার্সিং হোমের কেবিনে—

কানের মধ্যে বাজতে থাকে ললিতার শেষ কথাগুলি; 'তুমি বড় একা হয়ে যাবে। এমন যদি কাউকে পাও যে ভাস্বতীকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসবে, তুমি আবার বিয়ে কোরো। তাতে আমার কোনও দুঃখ হবে না।'

॥ দুই ॥

চা খেতে খেতে চারখানা সংবাদপত্র পড়ে নেয় রাজীব মাথুর। প্রত্যেকটার সবটাই পড়তে হয় না, সময়ও নেই, তবে সবকটাই পৃষ্ঠাগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে হয়। ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার কয়েকটা বড় বড় নিয়মের মধ্যে একটা হল ঃ কোনও একটি ইংরিজি দৈনিককেও সর্বভারতীয় বলা যায়

না। সারা দেশে কী ঘটছে না-ঘটছে তা জানবার জন্যে এক ডজন দৈনিক পড়া বাধ্যতামূলক।

কলকাতার এক মক্কেলের একটা ভারি কেস নিয়ে লড়ছিল সুপ্রিম কোর্টে রাজীব মাথুর। অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের উত্তরাধিকার আইন অত্যন্ত জটিল। এক নিঃসন্তান ধনী মাড়োয়ারীর মৃত্যুর পর তার একপাল সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের মামলা। এদের মধ্যে যার দাবি অগ্রগণ্য সে রাজীব মাথুরের মক্কেল। মৃত মাড়োয়ারীর সে অন্যতম ভাগিনেয়। ব্যবসায়ে ছিল তার দক্ষিণ হাত। মৃত মাড়োয়ারী তাকে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সিংহভাগ দান করে উইল রেখে গেছে। সে উইলকে চ্যালেঞ্জ করেছে একসঙ্গে বাকি সব সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীরা। কলকাতা হাইকোর্ট উইলের লিগ্যালিটি স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু কয়েকটি টেকনিক্যাল ত্রুটি উল্লেখ করে 'রায়' দিয়েছেন যে আরও তিন সম্মানিত ভাগিনেয় সম্পত্তির কিছুটা বৃহত্তর অংশ পাবার যোগ্য। রাজীব মাথুরের মক্কেল আপীল করেছে সুপ্রিম কোর্টে। কলকাতা হাইকোর্টের মামলাও লড়েছিল রাজীবই।

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার 'পারসোনাল' কলমে রাজীবের মক্কেলের একটা ঘোষণা আজ অথবা কাল বেরুবার কথা। অতএব 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' ও 'হিন্দু' পড়বার পর, রাজীব মাথুর স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা খুলে বসল।

নজর পড়ল প্রথম বিজ্ঞাপনটির ওপর। নজর সরতে চাইল না।

বিজ্ঞাপনটি যাতে কলমের মাথায় থাকে তার ব্যবস্থা করবার কৌশলটি রাজীব মাথুরকে উৎসুক করে তুলল। বিজ্ঞাপনটি শুরু হয়েছে ইংরিজী বর্ণমালার প্রথম অক্ষর 'A' দিয়ে।

বাংলায় তর্জমা করলে বিজ্ঞাপনটি এইরকম: 'আমি ভারতীয় এক নারী; আঠার বছর কাজ করছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এদেশেরই আমি এখন নাগরিক। আমার বয়স ৩৫, আমি তন্বী, সম্ভবত সুন্দরী। আমার আমেরিকান স্বামী মারা গেছেন। আমি তিন বছর বয়সের একটি কন্যার জননী। জীবন আমার অতিশয় প্রিয়, আনন্দ আমার প্রধান পাথেয়। যদি কোনও উপযুক্ত বয়সের পুরুষ আমার সঙ্গে নিরংকুশ বন্ধুত্বে আগ্রহী, বন্ধুত্ব সহজে স্বাভাবিক পথে বিবাহ বন্ধনে উত্তীর্ণ হলে তাতে যাঁর আপত্তি থাকবে না, কিন্তু সে পুরুষকে আমার কন্যার স্নেহময় পিতা হতে হবে, আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছুক। এক মার্কিন নাগরিক মহিলাকে বিয়ে করে আমেরিকা যাবার পথ তৈরি করবার উদ্দেশ্য নিয়ে, প্লীজ, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না। আমি এক বছরের জন্যে নিউ দিল্লীতে এসেছি। আগ্রহ থাকলে লিখুন, কিন্তু লিখবার আগে ভালো করে নিজেকে যাচাই করে নেবেন সত্যি আপনার মধ্যে

আগ্রহ আছে কিনা।'

বক্‌স নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপনটি শেষ।

রাজীব মাথুর বার বার পড়ল বিজ্ঞাপনটি।

একটা অদ্ভুত অসাধারণ বিজ্ঞপ্তি। এর পেছনে রয়েছে যে নারী তার বয়স ৩৫।

সে বিধবা।

একটি তিন বছরের কন্যার জননী।

'জীবন আমার অতিশয় প্রিয়।'

'আনন্দ আমার প্রধান পাথেয়।'

সে তন্বী।

'সম্ভবত সুন্দরী।'

তার মৃত স্বামী আমেরিকান।

সে মার্কিন নাগরিক।

প্রথম লক্ষ্য তার বন্ধুত্ব।

বিবাহে আপত্তি নেই, যদি তা ঘটে 'সহজে, স্বাভাবিক পথে।'

শর্ত আছে ঃ কন্যার 'স্নেহময় পিতা' হতে হবে।

আরও শর্ত আছে ঃ আমেরিকা যাবার পথ-নয় এই নারী। কে এই রমণী!

হঠাৎ রাজীব মাথুরের মাথায় খেলে গেল, বিজ্ঞাপনের পেছনে যে নারী, সে রয়েছে এই শহরেই, হয়ত বসন্তবিহারে, হয়ত পাশের বাড়িতেই।

সারা শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল রাজীব মাথুরের।

॥ তিন ॥

দু দিন সময় লেগেছিল পারমিতার বিজ্ঞাপনটা তৈরি করতে। দশবার লিখে, শেষ পর্যন্ত মোটামুটি মনঃপূত হয়েছিল বিজ্ঞাপনের ভাষা।

নিজেকে কতটুকু বিজ্ঞাপিত করা যায় একশ অক্ষরে?

নিজেকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে এক অজানা অচেনা নামহীন ঠিকানাহীন মধ্যবয়সী পুরুষসমাজে, যেখানে হয়ত জীবন নামক নদী আর প্রফুল্লিত উল্লাসে প্রবাহিত নয়, তার গতি ধীর-মন্থর, প্রবাহ শেষ অথবা অতিশয় ক্ষীণ।

দু মাস হল পারমিতা এসেছে দিল্লীতে। নিজের বাড়িতে। না, তা ঠিক নয়, বাবার বাড়িতে।

নিক্ হঠাৎ মরে গেল, আধঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাবার অবকাশ পর্যন্ত ছিল না। ফোন করার দশমিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এল, তার সঙ্গে দুজন পুরুষ, এক মহিলা। তারা যা করবার সব করল। নিক্ বোধহয় তার আগেই চলে গিয়েছিল। তারা যখন নিককে মৃত ঘোষণা করলে তখন সকাল চারটে বাইশ। ঠিক ত্রিশ মিনিট আগে পারমিতা নিদ্রিত নিকের গলা থেকে বেরিয়ে আসা বিশ্রী আওয়াজ শুনে জেগে গিয়েছিল। নিকের তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। বার বার ডাকবার পর অতি কষ্টে চোখ খুলল। কিছু বলবার জন্যে বার বার চেষ্টা করল। আওয়াজ বেরুল না গলা থেকে। ঠোঁটের প্রচেষ্টা থেকে পারমিতা বুঝতে পারল নিক্ বলছে হস্‌পিটল।

শয্যার পাশেই টেলিফোন। পারমিতা টেবিলে রাখা ডিজিটল ঘড়িতে দেখল ৩ঃ৫২। অ্যামবুলেন্সের নম্বর ডায়াল করল।

ফিরল নিকের পাশে। নিক্ বেহুঁস।

তার বিশাল দেহ অনাবৃত।

পারমিতার চোখ দেখতে পেল কোনও কুশলী ভাস্করের হাতে কালো পাথরে মূর্ত বিশাল এক পুরুষদেহ।

আদম?

আদম কি কৃষ্ণকায় ছিল? অথবা শ্বেতকায়?

নিক্! নিক্! নিক্! শুনতে পাচ্ছ? এক্ষুণি অ্যামবুলেন্স আসছে। 'নিক্! নিক্! নিক্!'

নিকলস ব্রুটাস টমসন গভীর নিদ্রায় ডুবে রয়েছে।

গভীর প্রশান্তিতে ধ্যানস্থ শায়িত তার দেহ।

একে ডেকে আর লাভ নেই। সব ডাক, আজকের পরপারে চলে গেছে?

পারমিতা বুকে কান রাখল। নিঃশব্দ। চোখের পাতা খুলতে গিয়ে খুলল না।

এমন মহান্ দিগদিগন্ত প্রসারী নিদ্রাকে ভাঙতে নেই!

নিশ্চুপ, নিথর চোখে চেয়ে রইল কৃষ্ণ পাথরে তৈরি নির্বাক নিশ্চেতন পুরুষের পানে।

হঠাৎ দেখতে পেল পারমিতা নিকের ঠোঁট আবার কাঁপছে। মুখের ওপর উঠে আসছে ফেনা।

শরীরের ওপর ঝুকে পড়ে চেঁচাতে লাগল, 'নিক্! নিক্! কিছু বলছ? কিছু বলতে চাইছ, নিক্?'

স্বর এবারও বেরুল না।

কিন্তু ঠোঁটের অস্থির অন্তিম বেপরোয়া চাঞ্চল্য তিনটি শব্দের একটি মৃত্যুহীন বাণী স্পষ্ট তৈরি করে শেষ উপহার, শেষ পুরস্কার রেখে গেল

পারমিতার জন্যে :

'আই লাভ ইউ।'

অ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা নিকলস ব্রুটাস টমসনের দেহকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। পোস্ট মর্টেম হবে। দেহ থাকবে তারপর মর্গে। পারমিতা আগাম-ই বলে যেন ব্যবস্থা করে দেহকে ফিউনারেল হোমে পাঠানোর।

ঘণ্টা তিনেক পরে পারমিতা দিল্লীতে ফোন করল ওর বাবাকে।

'বাবা!'

নিউ দিল্লীর গ্রেটার কৈলাসের বাড়িতে নিজের শোবার ঘরে ফোন ধরেছিলেন উৎপল মুখার্জি, পারমিতার পিতা।

'মিতা? হ্যালো! মিতা?'

'বাবা!'

'কি হয়েছে, মিতা? কি হয়েছে বলো আমাকে।'

'খুব খারাপ খবর বাবা।'

'বল, শিগ্গির বলো।'

'নিক্—'

'কি হয়েছে? কি হয়েছে নিকের? হার্ট অ্যাটাক হয় নি তো?'

'হার্ট অ্যাটাকে আজ সকালে চার ঘণ্টা আগে নিক্ মরে গেছে, বাবা।'

পারমিতা এরই মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে।

তার কণ্ঠস্বর ধীর ও ভারি।

উৎপল মুখার্জি বোবা হয়ে গেছেন।

'তুমি ঠিক আছ তো বাবা?'

'হ্যাঁ মা, ঠিক আছি। প্যাখি ভাল আছে তো?'

'হ্যাঁ, বাবা। পাখি পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছিল। একটু আগে উঠেছে।'

'কী করে এমন ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল?'

'ঘুমের মধ্যে। গোঁ গোঁ শব্দ শুনে সকাল চারটে নাগাদ আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখন নিকের জ্ঞান নেই। দশ মিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। বিশ মিনিট চেষ্টা করল হার্টটাকে রিভাইভ করতে। হল না। এখন দেহ হাসপাতালে রয়েছে।'

'আমি চলে আসব?'

'না, বাবা, তোমার এসে কিছু লাভ হবে না। নিকের ভাইদের খবর দিয়েছি। বুড়ী মাকেও। তারাই সব ব্যবস্থা করবে।'

'তুমি একা একা—'

'আমি ভাবছি বছর খানেকের লম্বা ছুটি নিয়ে তোমার কাছে চলে যাব।'

'খুব ভাল হবে। তোমার বিশ্রাম চাই। ঐ পরিবেশ থেকে সরে পড়া দরকার।'

'তিন দিন লাগবে ফিউনারেল হতে। তারপর আমি আমার অপিসের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলব। মনে হচ্ছে না, লম্বা ছুটি দিতে আপত্তি করবে।'

'কবে আসতে পারবে?'

'মাস খানেক তো অন্তত লেগে যাবে সব ব্যবস্থা করতে। এই অ্যাপার্ট-মেন্টটা সাব-লেট করতে হবে। পয়সা-কড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। তোমাকে জানাব বাবা।'

'নিশ্চয়। আমিও তোমাকে ফোন করব। রোজই ফোন করব। শক্ত থেকো। নিজেকে সামলে নিও।'

'দাদাকে খবর দিয়েছ?'

'একটু আগেই খবর দিয়েছি। ও চলে আসছে এখানে আজই।'

'তবু ভাল। তোমাদের দুজনেরই মনের জোর অনেক। স্থির থেকো।'

'তুমিও ঠিক থেকো, বাবা। মনে রেখো, তোমাকে আমার ভীষণ প্রয়োজন।'

'তুমিও মনে রেখো, মা, আমি আছি তোমার পাশে।'

উৎপল মুখার্জি'র মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে এসেছিল, 'তবু ভাগ্য তোমার মা বেঁচে নেই। তাঁকে এ আঘাত সইতে হল না।' কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিলেন নিজেকে।

॥ চার ॥

দশ হাজার মাইল ব্যবধানে পিতা ও কন্যা, দুই বিভিন্ন এবং কখন-মিলিত পথে, একই মহা রহস্যময় অন্তিম-সমাপ্তির কথা চিন্তা করছিলেন যে বছর এই কাহিনীর জন্ম সে বছরের গ্রীষ্মে।

যে মহাসমাপ্তির নাম মৃত্যু।

শ্যামসমান হোক অথবা দানবসমান, তার দাপট ও তার ভৈরব মহাশক্তি নিয়ে কারুর কোনও সন্দেহ নেই।

ছ বছর হল উৎপল মুখার্জি'র স্ত্রী, পারমিতার মা, সর্বাণীর মৃত্যু ঘটেছে। উৎপল মুখার্জি নিজেই গাড়িতে ড্রাইভ করে তাঁকে হাসপাতালের নার্সিং হোমে নিয়ে গিয়েছিলেন। দুদিন পর স্ট্রেটার কৈলাসের বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন স্ত্রীর মৃতদেহ নিয়ে। নিজের বাহু দিয়ে স্ট্রেচার থেকে মৃতদেহ

গাড়ির পেছনের সীটে শুইয়ে রেখেছিলেন। গাড়ি ড্রাইভও করেছিলেন নিজেই।

ভাই-এরা, বন্ধুরা বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল।

উৎপল মুখার্জি তাদের বলেছিলেন, 'ওকে আমি ড্রাইভ করে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলাম, বাড়িও নিয়ে যাব আমিই, আমার গাড়িতে, নিজে ড্রাইভ করে। আমার ড্রাইভিং-এ সর্বাণীর দারুণ বিশ্বাস ছিল।' পুত্র অশোক ও কন্যা পারমিতাকে পাশে বসিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়েছিলেন।

টানা দু বছর কিড্নির অসুখে ভুগেছিলেন সর্বাণী। শেষ পর্যন্ত কিডনির কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। দেহ প্রাণকে আর ধরে রাখতে পারল না।

ছত্রিশ ঘণ্টা নিদারুণ কষ্ট পেয়েছিল সর্বাণী। নিঃশ্বাসের কষ্ট। প্রতি মুহূর্তে আর্ত পিপাসার কষ্ট। ছত্রিশ ঘণ্টা শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে যন্ত্রণায় ছটপট করতে দেখেছিলেন উৎপল মুখার্জি। তার সেবা করে গিয়েছিল সর্বাণীর ছোট বোন, বোনের সদ্য মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে আসা ডাক্তার ছেলে।

ঐ অসম্ভব যন্ত্রণার মধ্যেও সর্বাণী খোঁজ করেছিল স্বামীর পেটে কিছু পড়ল কিনা। রাত্রিতে যন্ত্রণায় ছটফট করবার মধ্যেও বোনকে বলেছিল, ওকে একটু শুয়ে নিতে বল। সারা রাত জেগে থাকলে শরীর ভেঙে পড়বে।

পারমিতাকে ফোন করা হয়েছিল নিউ ইয়র্কে।

অশোককে জার্মেনীতে।

দুজনের এসে পৌঁছবার জন্যে অসম্ভব যন্ত্রণা সহ্য করেও পুরো জ্ঞানে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে বেঁচে ছিলেন সর্বাণী। ডাক্তাররা তাঁকে অজ্ঞান করে রাখতে চেয়েছিল। তিনি কিছুতেই রাজী হননি।

"আমি দেখতে পাচ্ছি ওরা আসছে," আর্ত স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বার বার বলছিলেন সর্বাণী। "আমি ওদের আসা পর্যন্ত বেঁচে থাকবই। না থাকলে ওরা খুব দুঃখ পাবে। আমাকে ক্ষমা করবে না।"

একে একে আত্মীয় স্বজন বন্ধুরা দেখতে আসছিল।

সবার কাছে সর্বাণীর এক অনুরোধ, ওঁকে দেখো। উনি বড্ড একা হয়ে যাবেন।'

বাড়ির পুরাতন ভৃত্য শ্রীরাম হাপুস কান্না নিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

সর্বাণী তাঁকে বলেছিলেন, 'সাহেবের সঙ্গেই থেকো, শ্রীরাম। সাহেবকে ছেড়ে চলে যেয়ো না।'

যন্ত্রণার আর্তনাদের মধ্যেই একবার উৎপল মুখার্জিকে বলেছিলেন, 'তুমি একটা ড্রাইভার রেখে নিও। নিজে আর গাড়ি চালিয়ো না।'

নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করে অশোক ও পারমিতা লন্ডন থেকে একই ফ্লাইটে দিল্লী এসে গিয়েছিল। পালাম থেকে সোজা চলে এসেছিল মূলচাঁদ হাসপাতালের নার্সিং হোমে।

তারা ঘরে ঢুকতে সর্বাণী বড় বড় চোখের সবটুকু মেলে আধ মিনিট তাকিয়ে রইলেন পুত্র-কন্যার মুখে। ঐ আধ মিনিট তাঁর কোনও যন্ত্রণাবোধ ছিল না।

বললেন, 'তোমরা এসে গেছ?'

নিঃশ্বাস টেনে বললেন, 'কাছে এসো।'

কাছে এসে ভাইবোন একসঙ্গে হাত রাখল মার কপালে। গালে। মাথায়।

সর্বাণীর সব যন্ত্রণা প্লাবনের মত ফিরে এল। অস্থির ব্যথায় নিঃশ্বাসের কষ্টে আগ্রাসী পিপাসায় তাঁর দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল।

মাসি ভাইবোনকে বলল, 'বত্রিশ ঘণ্টা এইভাবে যন্ত্রণা সহ্য করে যাচ্ছে তোমাদের আসবার অপেক্ষায়।'

পারমিতা বলে উঠল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে, মা?'

সর্বাণী বললেন, 'কষ্ট আমার হচ্ছে না। হচ্ছে আমার শরীরটার।'

একটু পরে, আবার দম নিয়ে, 'বাবাকে রেখে যাচ্ছি।'

উৎপল মুখার্জি পরে অনেকবার ভেবেছেন, সর্বাণী শুধু বলল, বাবাকে রেখে যাচ্ছি। বলল না, বাবাকে দেখো। মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও সর্বাণী আমাদের একত্রিত সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুত হল না। আমরা অনেক আগেই ঠিক করেছিলাম, সন্তানরা বাঁচবে নিজেদের জীবন নিজেদের ইচ্ছে মত। আমাদের জন্যে তাঁদের বাঁচতে হবে এমন দাবি আমরা কখনও করবো না।

রাত্রেই ডাক্তাররা ঠিক করেছিলেন, ডায়ালিসিস করতে হবে। ভরসা বিশেষ ছিল না। তবু শেষ চেষ্টা।

উৎপল মুখার্জি সর্বাণীকে বললেন।

'কেন আমাকে আরও কষ্ট দেবে?' অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে আকুতির প্রশ্ন সর্বাণীর।

'ডাক্তাররা বলছেন, কাজ হতে পারে।'

'আমাকে এবার যেতে দাও, যেতে দাও', একেবারে ভেঙে পড়লেন সর্বাণী।

'যেতে দাও' বললেও কেউ কাউকে যেতে দিতে পারে না, দিল্লীর গ্রেটার কৈলাসের বাড়িতে বসে ভাবছিলেন উৎপল মুখার্জি।

যে যেতে চায় না, যার যাবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নেই, যাকে কেউ যেতে দিতে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত নয়, সকলেই উৎসুক যথাসম্ভব টেনে রাখতে, কাছে রাখতে, বুকের মধ্যে চেপে রাখতে, তাকেও চলে যেতে হয়, কেন যেতে

হয় এ প্রশ্নের জবাব কেউ কাউকে কোনওদিন দিতে পারেনি, পারবেও না, পারমিতা ভাবছিল নিউ ইয়র্কের পুরাতন বনেদী পাড়া ওয়েস্ট-এন্ড অ্যাভিনিউ-তে তার তিন বেড-রুম অ্যাপার্টমেন্টে বসে বসে।

ডায়ালিসিস ডাক্তাররা সর্বাণীকে দিতে পারেননি।

শরীর থেকে সারা বিষাক্ত রক্ত পুরোপুরি বার করে নিয়ে বিশুদ্ধ রক্ত ঢোকাতে হয় ডায়ালিসিস করতে হলে। দুটো প্রক্রিয়াই সমান কণ্টকর।

সর্বাণীকে ডায়ালিসিসের জন্যে তৈরি করবার সময় ডাক্তাররা দেখতে পেলেন রক্তের চাপ বিপজ্জনকভাবে কমে আসছে। রক্তের চাপ এভাবে কমতে থাকলে ডায়ালিসিস দেওয়া সম্ভব হবে না।

হঠাৎ সর্বাণীর শেষ দুর্গটি ভেঙে পড়ল। হার্টের জোরে তিনি বেঁচে-ছিলেন।

হৃৎপিণ্ড হঠাৎ দারুণভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ল।

জ্ঞান হারাবার আগে কাতর চোখে সর্বাণী তাকালেন উৎপল মুখার্জির পানে। সে চাহনি উৎপল কোনওদিন ভুলতে পারেন নি, পারবেন না।

তার মধ্যে ছিল গভীর ব্যথা, অনন্ত আকুতি, আকুল আকর্ষণ, প্রয়াণের পূর্বেকার ব্যাকুল বিভ্রান্তি।

সর্বাণীর শেষ কথা: 'আমি চলে যাচ্ছি,' মিহি সুরে অনেক দূর থেকে ভেসে এল উৎপল মুখার্জির কানে।

ডাক্তার পাশেই ছিলেন। নাড়ী দেখলেন। বুকে যন্ত্র লাগিয়ে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা যাচাই করলেন। তীক্ষ্ন আলো জেলে চোখ দেখলেন। তারপর বললেন, 'আমি খুব দুঃখিত, মিঃ মুখার্জি, আপনার স্ত্রী আর জীবিত নেই।'

উৎপল মুখার্জি একদৃষ্টিতে সর্বাণীর মুখখানা দেখছিলেন। দুদিনের অসহ্য অবিরাম যন্ত্রণায় তাঁর মুখখানা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। বিকৃতির গভীর রেখাগুলি এখন ভীষণ তাড়াতাড়ি মিলিয়ে গেল। মুখখানা দুমিনিটের মধ্যে প্রশান্ত হল, নির্মল হল।

সর্বাণী এখন অন্তিম মহাশান্ত নিদ্রায় নিদ্রিত।

তাঁর দেহে রোগ নেই, যন্ত্রণা নেই, তিনি সব ব্যথা যন্ত্রণার অতীত।

উৎপল মুখার্জি বহু পরে, অনেক সাবধানে সর্বাণীর মুখে হাত বুলিয়ে দিলেন। মুখে, কপালে, চুলে।

শরীর এখনও উষ্ণ।

হাতের আঙুলগুলি এখনও টলটলে।

বাহুর মাংস এখনও নরম।

উৎপল মুখার্জি চোখের সামনে আগে কাউকে মরতে দেখেন নি। তাঁর বাবার মৃত্যুর সময় তিনি অন্যত্র ছিলেন। মার পাশ থেকে চলে যাবার এক ঘণ্টা পরে ছোটভাই-এর বাড়িতে বৃদ্ধার শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল। সর্বাণীর অসুখের শেষ শ্বাসগুলিতে উৎপল মুখার্জির বারবার মনে হয়েছে চোখের সামনে স্ত্রীর মৃত্যু দেখতে পারার মত মনোবল তাঁর নেই। আমি পারব না, পারব না, পারব না, বার বার তিনি বলেছেন নিজেকে, এতটা শক্তি আমার নেই।

কিন্তু এখন, মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের পর, প্রাণহীন সর্বাণীর প্রশান্ত নিদ্রিত মুখের পানে তাকিয়ে উৎপল মুখার্জির মনে হল, মৃত্যু বুঝি সব সময়েই কেবল নিষ্ঠুর নয়, বুঝি সে জীবনের অবসান নিয়েই শুধু এসে দাঁড়ায় না, তার আরও কিছু অবদান আছে, সে যন্ত্রণার সমাপ্তি এনে দেয়; শরীর যখন আর নড়তে পারে না, প্রাণ যখন হয়ে ওঠে অসহ্য বোঝা, মৃত্যু তখন মুক্তি নিয়ে আসে, দরজা খুলে দেয়, দেহ থেকে প্রাণকে অপসৃত হবার দরজা, মৃত্যু তখন সহনীয়, যেন বন্ধু।

তুমি যেই হও, সর্বাণীর প্রাণহীন দেহের পাশে হাসপাতালের কেবিনে একা দাঁড়িয়ে অদৃশ্য মৃত্যুকে সম্বোধন করে নিঃশব্দে বলেছিলেন উৎপল মুখার্জি, তুমি যেই হও, তোমাকে দূরে রাখবার জন্যে আমার সাধ্যমত সব চেষ্টা আমি করেছি, যতটুকু সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশি লড়েছে সর্বাণী, ডাক্তাররাও করেছে যতটুকু তাদের হাতের ও মাথার সীমানায়, তবুও তোমাকে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি. আমরা সবাই হেরে গেছি তোমার কাছে ; কিন্তু তুমি সর্বাণীকে ভীষণ কষ্ট আর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছ, যে কষ্ট ও যন্ত্রণা তার কাছে আর আমার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমান অসহ্য, তোমাকে এখন আমি আর দুশমন মনে করতে পারছি না, মনে হচ্ছে তুমি বন্ধুর কাজ করেছ, তোমাকে এখন আমার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে, তুমি যেই হও, তুমি এখানে আছ কি নেই, আমার কথাগুলি তুমি শুনতে পারছ, কি পারছ না, তুমি যেই হও না কেন।

একটু সময়ের মধ্যেই লোকজন এসে পড়বে। উৎপল মুখার্জি সন্তর্পণে সর্বাণীর কপালে চুমু খেলেন, চুমু খেলেন তাঁর চোখে, অধর দিয়ে স্পর্শ করলেন তাঁর তখনও উষ্ণ অধর। খুব আস্তে সর্বাণীর কানে বললেন, 'তোমাকে এবার বাড়ি নিয়ে যাব, বুঝলে, আমি নিজে ড্রাইভ করে তোমায় নিয়ে যাব বাড়িতে।'

॥ পাঁচ ॥

পারমিতার শুধু মনে হল মৃত্যু, এবং ঈশ্বর, তাকে এমনি ঠকালেন কেন ? কি প্রয়োজন ছিল ? কি করেছি আমি যার জন্যে এই প্রতারণা অথবা শাস্তি আমার পাওনা ছিল !

আমেরিকায় এসে পড়াশুনা করে এ দেশে থেকে যাওয়াটা নিশ্চয় কোনও কুকাজ নয়। বাবা-মা আপত্তি করেননি !

একজন কালো আমেরিকানকে বিয়ে করাটা দুষ্কার্য হয়েছে আমার পক্ষে ? ঠিক, ভারতীয় মেয়েরা কালো আমেরিকানদের সঙ্গে বন্ধুত্বও করতে চায় না, প্রেম ও বিবাহ তো দূরের কথা ! কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম হবার অধিকার নিশ্চয় আমার আছে !

নিকলস ব্রুটাস টমসন কালো আমেরিকান ! কিন্তু মানুষটা তো ছিল আগাগোড়া শুভ্র ! এমন একটা মানুষকে জীবনের পূর্ণ মধ্যাহ্নে বিনা নোটিসে হঠাৎ খতম করে দেবার কোনও যুক্তি কি আমায় দেখাতে পার, হে মৃত্যু, হে ঈশ্বর ?

ছ ফুট দু ইঞ্চি দেহ, ওজন একশ আশি পাউন্ড। সারা দেহের কোথাও একটু মেদাধিক্য নেই। সবল শরীর, শক্ত মাংসপেশী, ছাত্রকালে স্কুলের বেসবল টীমের ছিল কোয়ার্টার ব্যাক্ ! অসুখ কাকে বলে জানতো না, পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে একদিন অসুস্থ হতে দেখিনি লোকটাকে, সে-কিনা ঘুমের মধ্যে মরে গেল বিনা নোটিশে, আচমকা !

রাত্রিতে আমাদের, আমাকে আর পাখিকে, নিয়ে ড্রাইভ করে চায়না টাউনে গেল। গাড়ি চালাবার অমন সহজ জন্মগত পারদর্শিতা খুব মানুষের থাকে না এই গাড়ি আর-গাড়ি, কেবল-গাড়ির দেশটায়ও। কত মজা করে খাওয়া হল, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান হল, ফেরার পথে হাজির হল ইস্ট হার্লেমের বহু পরিচিত 'বারে', আমি একটু আপত্তি করলেও, দু পেগ হুইস্কি খেল অন-দ-রকস্। পাখিকে দর্শকদের মধ্যে বসিয়ে আমরা একটু নেচেও নিলাম, বাড়ি ফিরতে বারোটা বেজে গেছে। শুক্রবারের রাত বারোটা তো কিছুই নয়, পাখি গাড়িতে ঘুমিয়ে না পড়লে নিশ্চয় আমরা আরও দেরি করে ফিরতাম।

বাড়ি ফিরে সেই চিরকালের খোশমেজাজ। কিচেনে গিয়ে অরেঞ্জ জুস নিয়ে এল দু গ্লাসে। একটা আমার হাতে তুলে দিয়ে, আমাকে নিয়ে বসল বৈঠকখানার নরম লাভসীটে, কমলা লেবুর রস পান করতে করতে আমরা গল্প

করলাম, কখন যে একটা বেজে গেল টেরও পেলাম না, দেখলাম নিক্ যেন ঘুমিয়ে পড়ছে। চোখ ঢুলু ঢুলু। এটা কখনও আগে দেখি নি, তাই একটু খটকা লাগল।

'তুমি কি ক্লান্ত বোধ করছ,' আমি প্রশ্ন করলাম।

'না তো! একটুও না!' করলেও নিক্ স্বীকার করবে না, আমি খুব ভাল করে জানি।

'আপিসে খুব খাটুনি গেছে?'

'না। স্বাভাবিকের বেশি কিছু নয়।' গেলেও ঠিক আমাকে বলবে না, আমি বিলক্ষণ জানি।

'আমি তো তোমাকে শুধু দুটো ড্রিংকস নিতে দেখেছি। আজ কি বিকেলে ড্রিংক করেছিলে?'

ঐ একটা দোষ ছিল নিকলস ব্রুটাস টমসনের। মদ খেতে ভালোবাসত। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার আগে বেশ ভালো পরিমাণেই মদ্যপানের অভ্যেস ছিল। আমার খাতিরে অভ্যেসটা খুবই কমিয়ে আনা হয়েছিল, কিন্তু সুযোগ পেলে দু-চারটে ড্রিংকস ছেড়ে দেবার পাত্র নয় নিক্ টমসন, আমি খুব ভালো করেই জানি।

'এমন কিছু নয়! টেলার এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে এসেছিল আপিসে। ওর জন্মদিন ছিল আজ। চারজন মিলে এক বোতল শ্যাম্পেন খেলে একজনের ভাগে কতটুকু পড়তে পারে বলো!'

'অনেকখানি পড়তে পারে, এবং পড়েছে, এবং তা খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যাচ্ছে। এবার শোবার ঘরে চলে যাও। তোমার ঘুম পেয়েছে। যাও।'

'তুমি?'

'আমি স্নান করে আসছি। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না। যদি ঘুম পায় ঘুমিয়ে পোড়ো।'

স্নান সেরে ঘুমন্ত পাখি বিছানায় ঠিকমত শুয়ে আছে কিনা দেখে নিয়ে পারমিতা যখন শোবার ঘরে এল, তখন টেবিল ল্যাম্পের মৃদু আলোয় নিদ্রিত নিকলসকে দেখতে পেয়ে পুরাতন অথচ সর্বদা নতুন সেই একান্ত পরিচিত এবং সর্বদা বিস্ময়কর আবেগ তাকে পুনরায় চেপে ধরল।

ছ বছর আগে এই কালো পুরুষটিকে দেখে প্রথম এই পুরাতন আবেগের উত্তাপ অনুভব করেছিল পারমিতা মুখার্জি।

নিউইয়র্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সে এম. এ. পড়ছে দর্শন শাস্ত্রে। আধুনিক যুগের দর্শনচিন্তা তার অধ্যয়নের প্রধান বিষয়। ফিলসফি হল—যার সামনের উদ্যানে চিন্তারত রদ্যাঁর ভাস্কর্য মূর্তি বিশ্ববিখ্যাত—পারমিতার প্রতিদিনকার তীর্থস্থান, বাটলার লাইব্রেরী তার আশ্রম। সেদিনটা

ছিল বিশেষ উত্তেজনার। প্যারিস থেকে রেমন্ড অ্যারন্ এসেছেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক হয়ে। বর্তমান যুগের দার্শনিক চিন্তাধারাকে তিনি দুখানা বিখ্যাত গ্রন্থে সমবেত করেছেন নিজের তীক্ষ্ন সূক্ষ্ম সমালোচনার সঙ্গে। অ্যারন্ কলম্বিয়ার দর্শন বিভাগে দশটি বিশেষ বক্তৃতা করবেন : বাৎসরিক টমাস ড্যুই বক্তৃতা। স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীরাই শুধু বক্তৃতা শুনতে পারবে। দর্শন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তো আসবেই, অন্যান্য কয়েকটি বিভাগ থেকেও অনেকে আসবে—সাহিত্য, সমাজনীতি, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ইত্যাদি। অ্যারনের বক্তৃতার বিষয় : কার্ল মার্কস্ কি বিংশশতাব্দীর প্রধান দার্শনিক ?

পারমিতা জানতো এ যুগের ফরাসী মানসিকতায় যে দুই চিন্তাবীরের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে দৃঢ় তাদের নাম অ্যারন্ এবং সার্ত্র্। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেরকার ফরাসী বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রধানত দুটি দলে বিভক্ত—অ্যারন্‌পন্থী, নয় সার্ত্র্‌পন্থী। পারমিতা আরও জানত, অ্যারন্ কমিউনিজমের ঘোরতর বিরোধী, সোভিয়েত রাশিয়ার কঠোর সমালোচক, সোভিয়েত-বিরোধী মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির প্রবল সমর্থক। অ্যারন্ কিন্তু মার্ক্‌স্‌কে কোনওদিন বর্জন করেননি ; শুধু দেখাতে চেয়েছেন সোভিয়েত কমিউনিস্টদের হাতে মার্ক্‌স্‌বাদ কী করে ভ্রষ্ট ও বিকৃত হয়েছে। পারমিতার দর্শন পিপাসায় রাজনৈতিক উত্তাপ ছিল না। দর্শনকে তার কাছে কেবল মানসিক ঐশ্বর্য মনে হত। যতখানি উৎসাহের সঙ্গে পারমিতা অ্যারন্ পড়ত ততখানি উৎসাহের সঙ্গেই সার্ত্র্।

পারমিতা বেশ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পেল তার ঠিক পাশে এসে বসল একটি কৃষ্ণকায় পুরুষ। বসবার আগে সবিস্ময়ে অনুমতি নিয়ে নিল, 'আমি এখানে বসতে পারি কি ?'

চার বছর বাস করছে পারমিতা নিউইয়র্কে, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, ফিলসফিতে ডক্টরেট করবার সংকল্প। এই চার বছরে একটি কালো আমেরিকানের সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব হয়নি। না পুরুষ, না নারী। ফিলসফি ক্লাসে কালো ছাত্রছাত্রী নেই। নিজের ক্লাসের বাইরে কালো ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা হয়েছে অনেকবার, কিন্তু কেউ কোনওদিন বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে আসেনি, পারমিতাও এক-পা এগোয়নি।

পারমিতা স্বভাবে ইনট্রোভার্ট—অন্তর্মুখী। নিজেকে নিজের মধ্যে রেখে দেবার অভ্যেস। এ অভ্যেস সে পেয়েছে মার কাছ থেকে। নিজের মধ্যে মগ্ন থেকে পারমিতা অবশ্য মার মত বিষণ্ণতায় জড়িয়ে যায় না। বরং একটা অকারণ অহেতুক খুশির সুগন্ধ অহরহ তার অভ্যন্তর থেকে ভেসে আসে চিন্তার হাওয়ায়। পারমিতা নিজেকে নিয়ে অনেকখানি পরিপূর্ণ। অন্য

কারুর অভাব সে খুব একটা বোধ করে না, বিশেষ করে পুরুষ-বন্ধুর অভাব। যে অভাববোধ থেকে মেয়েরা প্রেমে পড়ে তা পারমিতার জানা নেই। যে-স্বকীয় সৌরভ মেয়েরা পুরুষদের মনে ও স্নায়ুতে মিশিয়ে দিতে চায় সে সৌরভ তার নেই।

আহা-মরি সুন্দরী না হলেও পারমিতা সুশ্রী। বাঙালী মেয়েদের পক্ষে তার দেহ দীর্ঘ —পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি। শরীর তন্বী, ওজন একশ বত্রিশ পাউন্ড। কোমর সরু, স্তনযুগল পুষ্ট, প্রায় সমতল পেট, বেশ ভারী নিতম্ব। মাথায় একঝাঁক কোঁকড়া চুল, কাঁধের নিচে ছাঁটা। পারমিতার বর্ণ হালকা-শ্যামল, চোখ দুটি বড় বড়, ফিকে-কালো। চওড়া চোয়াল, দীঘল নাক, মাংসল ওষ্ঠাধর। মুখে দৃঢ়তা ও প্রগল্‌ভতা একসঙ্গে মিলে মিশে রয়েছে, একে অপরকে শাসনে রাখছে। পারমিতা জানে না তার মুখে ও শরীরে বেশ যৌন-আবেদন বিচরণ করছে। কোনও পুরুষ এ কথা বলেনি তাকে। তার যারা মেয়ে বন্ধু তাদের মধ্যে দু-একজন এসব প্রসঙ্গের অবতারণা করতে গিয়ে উৎসাহ পায়নি।

অ্যারনের বক্তৃতা শোনবার মধ্যেই পারমিতা তিনবার পাশে-বসা কালো পুরুষটিকে তাকিয়ে দেখল। তৃতীয়বার তাকাবার সময় দুজনের চোখ একত্রিত হল, লোকটি ছোট্ট একটি হাসির মারফৎ কী-যেন একটা বার্তা পাঠাল পারমিতাকে, যার অর্থ সে ঠিক বুঝল না, যদিও টের পেল, তিন-তিনবার সে লোকটিকে তাকিয়ে দেখেছে, যে-কাজ এর আগে তার দ্বারা কৃত হয়নি, এবং যা এখন কৃত হবার জন্যে তার একটুও লজ্জা অথবা অপ্রস্তুত লাগছে না।

বক্তৃতা শেষ হবার পর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই লোকটি পারমিতার দিকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে বলে উঠল, 'রেমন্ড অ্যারন্ ইজ রেমন্ড অ্যারন্, ইজ্‌ন্ট হি ?'

পারমিতা বলল, 'রাইট্ !'

পারস্পরিক পরিচয় হল।

নিকলস টমসন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ছে। পুরোপুরি ছাত্র সে নয়। নিউইয়র্ক সিটি গভর্নমেন্ট—নগর পালিকা—তাকে খরচ দিচ্ছে "খুচরো" পড়াশোনার মাধ্যমে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করবার।

নিকলস টমসন বলল, 'আমি আপনার মত শিক্ষিত নই। আমি শিক্ষিত হবার চেষ্টা করছি।'

দুজন একসঙ্গে 'আলমা মেতর' পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবার সময় নিকলস বলল, 'আপনি লাঞ্চ খেয়েছেন ?'

পারমিতা বলল, 'না। আপনি ?'

নিকলস বলল, 'আপনাকে আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবার অনুরোধ করতে

পারি কি।'

প্রধান গেট দিয়ে বেরিয়ে দুজনে ব্রডওয়েতে চলে এল।

মিনিট তিনেক হাঁটার পরেই একটা রেস্তোরাঁ। 'আংক্‌ল্‌ টম্‌স্‌ কেবিন'।

'এখানে খাবেন?' নিকলস প্রশ্ন করল।

'বেশ তো?'

সেই প্রথম পরিচয়ের দিনই আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম, নিক। আমার জীবনের প্রথম ভালবাসা। একটা একেবারে অজানা আবেগ, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উঠে এসে আমার সব শরীরটাকে অবশ করে দিয়েছিল। তুমি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে আমেরিকার কালো সমাজের পরিচয় দিয়েছিলে আমাকে, আমি তোমার কথা শুনছিলাম, তোমার চোখে চোখ রেখে, আর আমার অন্তরের গভীরে সাত রং রামধনু ছড়িয়ে পড়ছিল। তোমার বাবা তোমার জন্মের তিন বছর পরে উধাও হয়ে গিয়েছিল। মা তোমাকে মানুষ করবার দায়িত্ব নিতে চায়নি। নিউইয়র্কে মাতামহের পরিবারে লালিত হয়েছিলে তুমি, দিদিমা তোমাকে নিজের সন্তানের মত বুকে তুলে নিয়েছিলেন। হাই স্কুল পাস করে কলেজে যাবার স্বপ্ন বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে তুমি চাকরি নিয়েছিলে এক মোটর গাড়ি মেরামতের কারখানায়। ট্রেনিং নেবার পর ওখানেই রয়ে গিয়েছিলে পুরো সাত বছর এবং ওখানে থেকেই সিটি কলেজে রাত্রে ক্লাস করে পাঁচ বছরে বি. এ. পাশ করে নিয়েছিলে। তারপর কালো আমেরিকানদের উন্নয়নের জন্যে সদ্য—প্রতিষ্ঠিত নিউইয়র্ক আরবান কোয়ালিশনে তুমি চাকরি নিয়েছিলে। মাইনে ভাল ছিল না, কিন্তু নিজের সমাজের পিছিয়ে-পড়া লোকেদের এগিয়ে যাবার পথ তৈরির বিরাট কঠিন কাজে সামান্য সাহায্য করতে পারার সুযোগ তোমার কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। আরবান কোয়ালিশনে কাজ করবার সময়ই তুমি কালো আমেরিকানদের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলে। মার্টিন লুথার কিং তোমার গুরু এবং নেতা। ষাটের দশকে তোমাকে দু বছরের জন্যে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে সৈনিক হবার জন্যে আদেশ করা হয়েছিলো। তুমি ড্রাফট কার্ড পুড়িয়ে ফেলেছিলে আরও কয়েকজন সাদা ও কালো যুবকের সঙ্গে একত্রে। এ জন্যে তোমাকে তিন বছর জেল খাটতে হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তুমি সিভিল রাইটস্‌ য়ুনিয়নে চাকরি নিয়েছিলে, সঙ্গে সঙ্গে 'খুচরো ছাত্র' হয়ে পড়ছিলে এম. এ. পাশের জন্যে। এখন তোমার বয়স আটত্রিশ। এরই মধ্যে আঠাশ বছর বয়সে একটি কালো মেয়েকে তুমি বিয়ে করেছিলে। দু বছরের বেশি টেকেনি সেই বিয়ে, তোমার স্ত্রীর 'সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার' সঙ্গে বিরোধ লেগেছিল তোমার 'সামাজিক সচেতনতার'। এখনও তুমি সিভিল লিবার্টিস্‌ য়ুনিয়নেরই কাজ করছ। তোমার প্রধান কাজ

র‍ুনিয়নের জন্যে টাকা সংগ্রহ—তুমি ওদের প্রধান ফান্ড রেইজর। টাকা তোলার জন্যে তোমাকে বড় বড় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ার-ম্যানদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখতে হয়, রাখতে হয় বড়-মাঝারী-ছোট শত শত ফাউন্ডেশনের সঙ্গে। ধনবান্ প‍ুর‍ুষ ও স্ত্রীলোকদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। তোমার বয়স এখন আটত্রিশ।

'এই হল আমার পরিচয়,' বলেছিল নিকলস টমসন। 'এবার আপনার কথা বল‍ুন।'

আমি সেদিন তোমাকে কিছ‍ুই বলতে পারিনি, নিক্। নিজের কথা বলতে আমার ম‍ুখ সহজে খ‍ুলতে চায় না। তব‍ু ভেতর থেকে তোমাকে অনেক কিছ‍ু বলার একটা অভূতপ‍ূর্ব চাপ বোধ করছিলাম, কিন্তু ম‍ুখে আমার ভাষা তৈরি হচ্ছিল না।

আমি শ‍ুধ‍ু তোমার চোখে চোখ রাখছিলাম।

'আমি একটি ভারতীয় মেয়ে। পড়তে এসেছি এদেশে। শিখতে।'

'আর ?'

'আর কিছ‍ু নেই।'

'আরও অনেক, অনেক কিছ‍ু আছে।'

আমি বলেছিলাম, 'যদি থাকে, আপনাকে খ‍ুঁজে বার করতে হবে।'

তোমার ম‍ুখখানা খ‍ুশিতে আলোকিত হয়ে উঠেছিল।

'তার মানে, আপনার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে!'

'যদি আপনার ইচ্ছে ও আগ্রহ থাকে।'

'কবে ? কাল ? এই সময় ? লাঞ্চ ?'

'কেন নয় ?'

তুমি বলে উঠেছিলে, 'ওয়াও ! !'

॥ ছয় ॥

প্রথম প্রেম আমার, প্রথম প্রভাত, প্রথম প‍ূর্ণিমা, সম‍ুদ্রের প্রথম শিহর, পর্বতের প্রথম হাতছানি।

তুমি আমাকে ভাসিয়ে দিয়েছিলে, নিক্, তুমি আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলে, নিকলস ব্র‍ুটাস টমসন।

তুমি আমাকে অশেষ করে দিয়েছিলে। তোমাকে নিয়ে আমার বিস্ময়ের শেষ ছিল না।

আমি ২৬ বছরের ভার্জিন কন্যা ছিলাম তোমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই প্রথমবার প্রেমে পড়বার সময়।

এক বছর পরে আমাদের প্রথম পরিচয়ের প্রথম বার্ষিকীতে আমি তোমাকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াবার জন্যে আমার অ্যাপার্টমেন্টে নিমন্ত্রণ করেছিলাম।

এর আগেও অনেকবার তুমি এসেছ আমার অ্যাপার্টমেন্টে, আমি গেছি তোমার বাসায়। দুজনেই আমরা য়ুনিভারসিটি পাড়ার বাসিন্দা, য়ুনিভারসিটির ভাড়াটে। তুমি থাক ওয়েস্ট ১০৯ স্ট্রীট আর ব্রডওয়ের ওপর দশতলা একটা বাড়ির সাত তলায়। আমি রিভারসাইড ড্রাইভের ওপর ১১৮ স্ট্রীটের একটা বাড়ির বারোতলায়। দুটো বাড়ির মধ্যে দশ মিনিটের পায়ে-হাঁটা পথ।

আমরা অনেক সন্ধ্যায় রেস্তোরাঁয় খেয়েছি, সিনেমা দেখেছি, দেখেছি অফ্‌ব্রডওয়ের নাটক, তুমি আমাকে নিয়ে গেছ ঈস্ট্ হার্লেমে তোমার প্রিয় নাচের ক্লাবে, নাচের 'বারে'। আমাদের অনেক গল্প হয়েছে। বলেছ তুমি, আমি শুনেছি।

সেদিন আমি বলেছিলাম।

শুনে তুমি প্রথমে ভীষণ অবাক, পরে অসম্ভব আনন্দিত হয়েছিলে।

আমি বলেছিলাম, 'নিক্, আমি ভার্জিন, তা জান?'

তুমি বলেছিলে, 'জানবার সুযোগ তো দাওনি!'

'আমি বলেছিলাম, 'নিক্, আজ তোমাকে সে সুযোগ দেব। আমাকে আঘাত কোরো না।'

আরও এক বছর পেরিয়ে যাবার পর আমি দিল্লী গিয়েছিলাম এক মাসের ছুটি নিয়ে। তখন প্রথম মাকে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, বাবাকে বলেছিলাম।

আমাকে অবাক করে দিয়ে দুজনেই খুশি হয়ে সায় দিয়েছিলেন।

মা তোমার ফটো দেখে দারুণ খুশি!

'খুব সুপুরুষ দেখছি!'

আমি বলেছিলাম, 'না হলেও আমার কিছু এসে যেত না।'

আমার কথা কানে না নিয়ে মা বলেছিলেন, নিগ্রোর মত দেখতে নয় একেবারেই।'

আমি বলেছিলাম, 'ওটাই আমার একমাত্র দুঃখ।'

মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'জীবনে কিছু কিছু দুঃখ খুব সুখের।'

বাবা বলেছিলেন, 'সাহেব জামাই! তবু ভাল সাদা সাহেব নয়! কালো

সাহেব ! সহ্য করতে খুব কষ্ট হবে না।'

দেশ থেকে নিউ ইয়র্কে ফিরে এসে আমিই তোমার কাছে প্রপোজ করেছিলাম, নিক্।

চায়না টাউনে খেয়ে ভিলেজে ঘণ্টাতিনেক আড্ডা মেরে রাত বারোটার পর আমরা ফিরেছিলাম আমার বাসায়।

তুমি আমাকে দরজা অবধি পেঁাছে দিয়ে বিদায় নিতে যাচ্ছিলে।

আমি বলেছিলাম, 'না। আমার ঘরে এসো। তোমাকে কিছু বলার আছে।'

অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে তোমাকে সোফায় বসিয়ে পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আমি বলেছিলাম, 'নিকলস ব্রুটাস টমসন, তুমি আমার স্বামী হতে রাজি আছ কি ?'

নিক্, তোমার তখনকার চোখমুখ আমি কোনওদিন ভুলব না ! তুমি বড় বড় চোখ পুরো মেলে এক মিনিট নির্বাক অপ্রত্যয়ে তাকিয়েছিলে আমার মুখে।

আমি আবার বলেছিলাম, 'আমাকে তোমার পত্নী হতে দেবে ?'

এবার তোমার মুখে ভাষা এল, নিক্।

'তুমি সত্যি বিয়ের কথা বলছ ?'

'আমি খুব সত্যি বিয়ের কথা বলছি।'

'আমি কালো আমেরিকান। আমি নিগ্রো।'

'আমি ব্রাউন ইন্ডিয়ান।'

'আমার বাবার পরিচয় দিতে লজ্জা করে।'

'আমার বাবাকে নিয়ে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

'আমার মার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।'

'আমার মা তোমার ফটো দেখে মুগ্ধ।'

'আমার একবার বিয়ে হয়েছিল। আমি ডিভোর্সড্।'

'আমি তোমার জীবনীকে বিয়ে করব না, নিক্। বিয়ে করব তোমাকে, তোমার জীবনকে।'

এতক্ষণে তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকে চেপে ধরেছিলে।

পরের দিন সকালে তুমি বিদায় নেবার সময় তোমাকে বলেছিলাম, 'বাবা-মার একটা অনুরোধ রয়েছে তোমার কাছে।'

তুমি অপেক্ষা করছিলে।

'ওঁদের ইচ্ছে দিল্লীতে আমাদের বিয়ে হয় হিন্দুমতে। তোমার আপত্তি না থাকলে।'

'কিন্তু সে বিয়ে তো আমাদের আইন মানবে না, মিতা।'

'সিভিল ম্যারেজ হবে তার পরে। এখানে নিউ ইয়র্কে।'

তুমি খুব উৎসাহের সঙ্গে বলেছিলে, 'দুবার বিয়ে! গ্রেট্! আমি খুব রাজী।'

॥ সাত ॥

দিল্লীর গ্রেটার কৈলাসের বাড়িতে আমাদের বিয়ে হয়েছিল।

বাবা তাঁর বহু-পরিচিত এক যজমান ব্রাহ্মণের সঙ্গে তিন ঘণ্টা ধরে বিয়ের আসল মন্ত্রগুলির ইংরিজি অনুবাদ করে রেখেছিলেন। অনেক আনুষঙ্গিক পুজোমন্ত্র ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছিল। শুধু সম্প্রদান। বিবাহের অঙ্গীকার, সপ্তপদী ও যজ্ঞ রাখা হয়েছিল আমাদের জন্যে। আমার খুড়তুতো, মাসতুতো, পিসতুতো বোনেরা পায়জামা-কুর্তা পরা তোমার কপালে, গালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে তোমাকে বর সাজিয়েছিল। ফিকে কালো বর্ণ তোমাকে সেদিন অসাধারণ উজ্জ্বল ও আনন্দিত দেখাচ্ছিল, নিক্। মা আমার জন্যে কলকাতার 'আনন্দ' থেকে বালুচরী শাড়ি আনিয়ে রেখেছিলেন। আমিও সেদিন লাগাম ছেড়ে বিয়ের কনে সেজেছিলাম। তুমি বিমুগ্ধ চোখে আমাকে বার বার দেখছিলে। সে দৃষ্টি আমার দেহমনে চিরকালের জন্যে সোহাগের দাগ রেখে দিয়েছে, নিকলস ব্রুটাস টমসন। সে দাগগুলি কোনওদিন মেলাবে না, আমি চাই নে তারা মিলিয়ে যাক।

তুমি আমাদের সভ্যতার একাগ্রতা দেখেও মুগ্ধ হয়েছিলে। তোমাদের সভ্যতা মানুষকে তার শেকড় থেকে উৎক্ষিপ্ত শুধু করেনি, পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এখানে ওখানে ব্যতিক্রম ছাড়া, বাবা মার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক কমে কমে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে তারা একে অন্যের কাছে যেন অপরিচিত আগন্তুক! তোমাদের কালো সমাজে সামাজিক বন্ধন কিছুটা রয়েছে, কিন্তু দশটি দম্পতির মধ্যে সাতটির স্বামী হয় উধাও নয় উদাসীন, জননী ও সন্তানপালিকার সংখ্যা দেখে আতঙ্কিত হতে হয়।

তোমরা এমন একটা সভ্যতা তৈরী করেছ যেখানে মানুষ হয়ে গেছে লিলিপুট। আকাশ-ছোঁওয়া অ্যাপার্টমেন্ট বিলডিং-এ যারা বাস করি তারা লিলিপুট ছাড়া আর কি? বাড়িগুলো দৈত্য-দানব, আধুনিক নির্মাণবিদ্যায় ও সাজসরঞ্জামে চোখ ঝলকান, মন-ভোলান। কিন্তু তাদের কাছে মানুষগুলি হ্রস্ব, এবং একেবারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এক একটা বাড়িতে হয়ত দেড়শ

পরিবার বাস করছে—পরিবার বলতে অনেক ক্ষেত্রে হয় একক কোনও পুরুষ নয় কোনও নারী ; তারা কেউ কাউকে চেনে না ; এলিভেটার অথবা বেসমেন্টে কাপড় ধোবার সময় অথবা লবিতে মুখোমুখি বা দেখাদেখি হয়ে গেলে 'হ্যাই' ও একটু হাসি তোমাদের পারস্পারিক আদানপ্রদানের আরম্ভ এবং শেষ।

নিজের কথা বলবার মত আত্মীয় বন্ধু তোমাদের আর নেই।

অতএব, জীবনে ধাক্কা খেলেই তোমরা ছুটে যাও মনোবিকলন পারদর্শী ডাক্তারের কাছে ; ঘণ্টায় ষাট থেকে একশ ডলার দাম দিয়ে তাকে শুধু নিজের কথা বল, তাতে তোমাদের মনের গেরো খুলে যায়, তোমরা তোমাদের 'চিনতে পার', 'জানতে পার', মনের ভারসাম্য, স্থিতি ও সুস্থতার জন্যে সাইকিয়াট্রিস্ট তোমাদের অপরিহার্য।

তোমাদের তিনটি বিয়ের মধ্যে মাত্র একটিকে মজবুত ও পরিপুষ্ট বলা যায়। একটি তো ভেঙেই যায়, অন্য একটি নড়বড়ে চেয়ারের মত টিকে থাকে, তার ওপরে বসা যায় না।

তোমাদের তিনজন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মধ্যে দুজন কোনও-না-কোনও সময় সাইকিয়াট্রিস্টের শরণাপন্ন হতে বাধ্য।

এ অবস্থার পুরোপুরি বিপরীত তুমি দেখতে পেয়েছিলে ভারতবর্ষে।

অন্তত বাইশটি পরিবার তোমাকে সস্নেহ-সমাদরে গ্রহণ করেছিল।

তুমি দেখকে পেয়েছিলে আমরা কতো আন্তরিকতার সঙ্গে এখনও একে অন্যকে ধরে রাখি, সামলে নি।

আমরা যখন ঝগড়া-কলহ করি, তাও এক ধরনের প্রয়োজনীয় আদানপ্রদান কমিউনিকেশন।

আমাদের নীচতা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা অধিকাংশ সময়েই সরব, স্বপ্রকাশ। মানুষে মানুষে যোগাযোগ জীবন্ত রাখবার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, জীবন্ত যোগাযোগের অপরিহার্য উৎপাদন।

আমরা সমস্যার মুখোমুখি হলে আত্মীয় বন্ধুদের শরণাপন্ন হই।

জ্যোতিষীর কাছে ছুটে যাই।

জ্যোতিষী আমাদের সাইকিয়াট্রিস্ট।

সে সমস্যা, বিপদ, পদস্খলন, ব্যর্থতা, দুর্ভোগ ইত্যাদি বিকল্প অবস্থার গ্রহ-নক্ষত্র-উপজাত ব্যাখ্যা করে আমাদের বুঝিয়ে দেয়, যা শেক্সপীয়র একাধিকবার তাঁর নাটকগুলিতে লিখে গেছেন, আমাদের দুর্ভাগ্য-সৌভাগ্যের জন্যে দায়ী আমরা নই, দায়ী গ্রহ-নক্ষত্র-দেবতারা, যাঁদের পারস্পরিক সংযোগ-সন্ধি-বিরোধ-সংঘাতে আমাদের জীবনের ওঠা-পড়া, রৌদ্র-মেঘ, রঙীন প্রভাত, ধূসর সায়াহ্ন।

আমরা স্বস্তি পাই।

'তোমাদের জ্যোতিষ তো সবার সামনেই জন্মপত্রিকা নিয়ে আলোচনা করে, দেখছি ! তোমরা প্রাইভেসি চাও না !' তুমি প্রশ্ন করেছিলে আমাদের পারিবারিক জ্যোতিষীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর।

জ্যোতিষী বাবার, মার, আমার ঠিকুজিতে পর পর নজর রেখে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘোষণা করেছিলেন। তোমার জন্ম তারিখ, সময় ও স্থান লিখে নিয়েছিলেন ঠিকুজি তৈরী করার জন্যে।

'যারা প্রাইভেসি চায় তারা নিশ্চয় পেয়ে থাকে', আমি জবাব দিয়েছিলাম।

'তারা সংখ্যায় বেশি নয় !'

'জ্যোতিষীই পারে তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে। আমাদের কালচারে প্রাইভেসি, ইনডিভিজুয়ালিজম ইত্যাদি মূল্যবোধ সবে মাত্র ঢুকতে শুরু করেছে। আমি যদি জ্যোতিষীর সঙ্গে শুধু একা দেখা করতে চাই, কেউ কিছু মনে করবে না, অবাকও হবে না। কিন্তু সবাই একসঙ্গে জ্যোতিষীর গণনা শুনে নেওয়ার মধ্যে জীবনযাপনের একটা যৌথ শরিকানা আছে,যেটা আমাদের কাছে মূল্যবান। আমাদের কারুর জীবনই অন্য কারুর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, প্রত্যেকটা জীবন, নিকটতম পরিবারের মধ্যে, অন্য জীবনের সঙ্গে শক্ত সুতোয় গাঁথা।'

॥ আট ॥

আমাদের পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবন সুন্দর হতে পেরেছিল।

'তোমার জন্যে', বলতে তুমি আমাকে।

আমি উচ্চতম ঔদার্য দেখিয়ে বলতাম, 'ধন্যবাদ। তোমার জন্যেও কিছুটা বটে।'

যার মানে ছিল, পুরোপুরি তোমার জন্যে।

পি. এইচ. ডি, পাবার পর কলম্বিয়া য়ুনিভারসিটিতেই আমি একটা তুলনামূলক সামাজিক দর্শন প্রজেক্টে রিসার্চ ফেলোশিপ পেয়ে গিয়েছিলাম। জাপান-চীন-ভারত-আমেরিকা-ফ্রান্স-জার্মেনী এই ছটা দেশের সামাজিক দর্শন নিয়ে তুলনামূলক অনুশীলন আমার কাছে যতটা আকর্ষণীয় ততটাই শিক্ষা-মূলক।

তুমি আরবান কোয়ালিশনের প্রধান ফান্ড রেইজর পদে উন্নীত হয়েছিলে। এক বছরে পাঁচ মিলিয়ন ডলার অর্থ তুলে আনার পুরস্কার ছিল এই অপ্রত্যাশিত প্রমোশন।

আমাদের আয় ভালই। মধ্য-মধ্যবিত্তের কোঠায় আমরা। প্রতি মাসে বেশ কিছু আমাদের সঞ্চয় হয়ে থাকে। তুমি ছেলেবেলা থেকে বেশ হিসেবি হয়েই বড় হয়েছিলে, অর্থাভাবের বাধ্যকতার মধ্যে মানুষ হতে হয়েছিল তোমাকে। আর আমি? আমার তেমন কোনও অভাব-বোধ নেই কোনওদিন, যা পেয়েছি তাই মনে হয়েছে প্রচুর, তার বাইরে চাইবার প্রয়োজন বোধ করিনি।

অবশ্য, আমার দেশের বহু মানুষের সঙ্গে তুলনায় আমি অনেক-কিছু-পাওয়ার মধ্যে জন্মেছি, বড় হয়েছি। আমার বাবা সম্পন্ন মানুষ, উত্তরাধিকারে ও নিজের কর্মজীবনের অধিকারে। আমি বাবা-মার একমাত্র কন্যা। দুটি সন্তানের একটি। পড়েছি ভাল স্কুলে। কার্পেট, এয়্যার কন্ডিশন, ফ্রিজ, গাড়ি, টেলিফোন, টেলিভিশন, ভি-ডি-ও, হাই-ফাই মিউজিক সিস্টেম, কোনওটার অভাব ছিল না আমার দিল্লী-জীবনে। মামা-মাসি-কাকা-পিসি-দেরও ভাল অবস্থা, জীবনের নিকট গন্ডীর মধ্যে আমি দারিদ্র্য দেখিনি, ক্ষুধা, অচিকিৎসিত রোগ, উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর সন্তানসন্ততিদের নিয়ে দশরকম দুশ্চিন্তা, এসব দেখতে হয়নি আমাকে। তবু কি আমি জানতাম না, ছোট্ট বয়স থেকেই কি জানতাম না, যে আমার দেশের মানুষদের একশ জনের মধ্যে দুজনেও আমাদের জীবনমানের অধিকারী নয়, চল্লিশজন দারিদ্র্য-সীমানার নিচে বাস করছে, উপবাসী অভুক্ত, ক্ষুধা না থাকলেও কিছুটা ক্ষুধা ও অনেক-খানি অপুষ্টি একশর মধ্যে ষাট জনের দৈনন্দিন জীবন? এসবই আমার জানা, যদিও এসবের প্রকৃত অর্থ আমাকে কোনদিনও বুঝতে হয়নি, এবং একদিন তোমার সঙ্গে কথাবার্তার সময় আমি প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম, নিকু, যে দারিদ্র্যের সঙ্গে আমার পরিচয় শুধু বই আর সংবাদপত্র আর দূর-থেকে-দেখা আবছা ছবির মাধ্যমে, তার চেয়ে কাছাকাছি নয়, যদিও আমি সেই দেশের মেয়ে, যার জনসংখ্যার অধিকাংশ গরিব।

তুমি দারিদ্র্য শুধু চাক্ষুষ দেখনি, নিকু, চার হাতে-পায়ে তার সঙ্গে বাল্যকাল থেকে লড়াই করেছ। অভুক্ত থাকনি, কিন্তু ক্ষুধা পেটে নিয়ে কাজ করেছ বারো বছর বয়স থেকে, সন্ধ্যেবেলা ও শনি-রবিবার, চোখের সামনে অনেককে অনেক কিছু ভোগ করতে দেখেছ যা ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা, লোভ থাকা সত্ত্বেও তোমার নাগালের বাইরে, তুমি কড়া শাসনে নিজেকে স্বল্পাকাঙ্ক্ষী করে রেখেছ, হিসেবি স্বভাব তোমাকে সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করতে হয়েছে। তোমার দাদু-দিদিমার অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না, তাঁরা তোমাকে স্নেহ, আদর ও আশ্রয় দিয়েছিলেন, তোমার বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটানর সাধ্য ছিল না তাঁদের। দশ বছর থেকেই, তাই, তোমাকে প্রয়োজনের তাগে খুচরো কাজ করতে হয়েছে, লোকজনের বাড়ীর বাগান সাফ করে দেওয়া, ঘাস

কাটা, স্নুপারমার্কেট থেকে খদ্দেরদের বাড়ি সন্ধ্যেবেলা বাজার পৌঁছে দেওয়া, গাড়ি সাফ করা। ধনী সচ্ছল লোকেদের বাড়ির কাঁচ সাফ করা, ফ্যার্নিচার পালিশ করে দেওয়া, অপরের কাগজ বেচা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে।

ধনী উন্নত দেশের সন্তান তোমাকে দারিদ্র্যের ব্যূহ ভেদ করে জীবনের প্রশস্ত ক্ষেত্রে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

আর গরিব উন্নয়নশীল দেশের সন্তান আমাকে দারিদ্র্য ও অভাবের প্রকৃত চেহারা কোনওদিন দেখতে হয়নি।

তাই তুমি টাকা জমাচ্ছিলে ভবিষ্যৎকে সুখকর স্থিতিশীল ভিত্তির ওপরে গড়ে তোলবার জন্যে।

আমি টাকা জমতে দিচ্ছিলাম আমার প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া আশৈশব অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত বৈষয়িক অনাসক্তির জন্যে।

তোমার হিসেবি স্বভাবকে আমি ঠাট্টা করে কার্পণ্য বলতাম।

তুমি আমাকে মস্করা করে বলতে বৈরাগী—

'তুমি তো গৃহে বাস করেও সাধু', বলতে তুমি, 'কোনও কিছু তোমার চাইবার নেই।'

'একটা ছাড়া।'

'কি সেটা!'

'একটা নয়, একজন।'

'মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়, মিতা। মনে হয়, কোনও কাউকে, কোনও কিছুকে তোমার সত্যিকার প্রয়োজন নেই। তুমি নিজেকে নিয়ে বেশ মজে থাকতে পার।'

'ভুল।'

'আমি নিউ জার্সির সামারভিলের বাড়িটা কিনে ফেলতে চাই।'

'বেশ তো!'

'তোমার 'বেশ তো'র মধ্যে প্রাণের সুর নেই। শুধু আছে আমার কথায় সায়।'

'বেশ তো আছি আমরা!'

'কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটির অ্যাপার্টমেন্ট। কিচেন ভর্তি আরশোলা!'

'দুটো শোবার ঘর। প্রকাণ্ড বসবার ঘর। বিরাট কিচেন। একখানা পড়বার ঘর। দুটো বাথরুম। দুজন মানুষের এর চেয়ে বেশিতে কি দরকার!?'

'য়ুনিভার্সিটি সাত মিনিটের হাঁটা পথ। সাবওয়ে, পোস্ট অফিস, বাস স্ট্যান্ড সব হাতের কাছে! শুধু পথগুলি নিরাপদ নয়। রোজ একটা দুটো রাহাজানি, সপ্তাহে একটা খুন। দিনরাত গাড়ির ঘর্ঘর। দূষিত বাতাস ফুসফুসকে কালো করে দিয়েছে। লোক, লোক, লোক। একশ দশ লক্ষ লোক।

এত গায়ে ঘেঁসাঘেঁসির প্রথম শিকার সাধারণ ভদ্রতা। সারা আমেরিকায় এমন অভদ্র শহর দ্বিতীয় নেই।'

দশটা য়ুনিভারসিটি, বাইশটা বিখ্যাত মিউজিয়াম, পনেরটা প্রকাণ্ড লাইব্রেরি, আশিটা থিয়েটার, প্রতিদিন পৃথিবীর দেশ-বিদেশের সিনেমা, অন্তত সাতটা অপেরা, পাঁচটা অরকেস্ট্রা, তিনশ বইএর দোকান, হাজারখানেক নিউজ-স্ট্যান্ড। চার হাজার রেস্তোরাঁ—এমন কোনও দেশ নেই যার খাবার এখানে অপ্রাপ্য।

'পাড়ায় পাড়ায় অশ্লীল সিনেমাঘর। সেক্স্‌-ম্যাগাজিনের দাপটে কোনও নিউজ-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াবার জো নেই। পথে পথে ড্রাগ পেড্‌লার। কয়েক শ এইড্‌স্‌-এ আক্রান্ত পুরুষ, কোথায় কি ভাবে বিষ ছড়াচ্ছে তা জানবারও উপায় নেই, পঞ্চাশ পয়সা দাম দিয়ে ন্যাংটো স্ত্রীলোক এক মিনিট দেখবার জন্যে লম্বা লাইন, নোংরা রাস্তা, দাঁত বার করা বুড়ো রাস্তা, গায়ে-গায়ে নানান গাড়ি, সমুদ্রের ধারে সৈকতে দাঁড়াবার স্থান নেই।'

তর্কটা হাল্‌কা সুরে হলেও তার মধ্যে একটা স্পর্শকাতর অনুরোধ রয়েছে যা আমরা দুজনেই জানতাম।

আমি কোনওদিন ভাবিনি জীবনটা আমাকে কাটাতে হবে মার্কিন মুল্লুকে আমেরিকার নাগরিক হয়ে।

আমি এসেছিলাম নিউইয়র্কে পড়ার জন্যে; পড়া শেষ হলে, বেড়ান কুড়োনো শেষ করে, ফিরে যাব দিল্লীতে, জীবন গরব ভারতবর্ষের মাটিতে, এই ছিল আমার চিন্তাধারা।

হঠাৎ প্রেম নামক প্রভঞ্জনে সে প্রকল্প ছারখার। আমি হয়ে গেলাম নিকলস ব্রুটাস টমসনের পত্নী।

নিকলস ব্রুটাস টমসনের ভারতবর্ষে বাস করতে আপত্তি নেই। এক পায়ে সে দাঁড়িয়ে:

নিকলস ব্রুটাস টমসন ভারতবর্ষকে জড়িয়ে ধরতে তৈরি।

ভারতবর্ষ মোটেই তৈরি নয় তাকে জড়িয়ে ধরতে।

ভারতবর্ষে সে বিদেশী। নেপালী বা ভুটানী বিদেশী নয়। আমেরিকান বিদেশী।

ভারতবর্ষে পদার্পণ করবার আগে তাকে ভিসা সংগ্রহ করতে হবে। ছ মাসের বেশি অবস্থানের অনুমতি থাকবে না সে ভিসায়।

ভারতবর্ষে এসেই ছুটতে হবে সে দপ্তরে যেখানে বিদেশীদের রেজিস্ট্রেশন করতে হয়।

তাদের অনুমতি ছাড়া ভিসার মেয়াদ পেরিয়ে ভারতবর্ষে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষে তার চাকরি হতে পারে কোনও মার্কিন সংস্থায় স্বল্পকালের জন্যে। তাতে তার ভবিষ্যৎ গড়বে না, গড়বার পরিপন্থী হবে সে ধরনের সাময়িক চাকরি।

অতএব, আমাকেই বাস করতে হবে মার্কিন দেশে। নাগরিক না হলেও ইমিগ্রান্ট হিসাবে আমি এদেশে কাটিয়ে যেতে পারব, আমার 'ভারতীয়ত্ব' বজায় রেখে। কিন্তু জীবন কাটাতে হবে মার্কিন দেশেই।

যদি নিকোলাস ব্রুটাস টমসনের সঙ্গে আমি বিবাহিত থাকতে চাই।

নিক্, আমাকে বিয়ে করবার পরদিন থেকে এ ভয়টা তোমাকে আঁকড়ে ধরেছিল।

আমি তোমার সঙ্গে অনেক কাল থাকব তো? চিরকাল?

না-কি ভারতবর্ষ আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তোমার বাহুবন্ধন থেকে?

'তুমি আমার কাছে থাকবে তো, মিতা?' এ প্রশ্ন বার বার তোমার অন্তরের গভীর থেকে বেরিয়ে এসে বিদ্ধ করত আমাকে।

'তোমার অতবড় বাড়ি। বাবা মা'র মৃত্যুর পর অত ধন-সম্পত্তি। ভারতবর্ষের প্রতি তোমার এত প্রবল আকর্ষণ। বিশেষ করে আমেরিকা সম্বন্ধে তোমার হাজার রকমের অরুচি! তুমি থাকবে তো আমার সঙ্গে?'

আমার যে একটা ভাই রয়েছে, তা তুমি প্রায় ভুলেই যেতে।

তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল দিল্লীতে আমাদের বিয়ের সময়।

অশোক তার নাম—চলে এসেছিল হাইডেলবার্গ থেকে।

তিন বছরের বড় হলেও তাকে আমি প্রথম থেকে অশোক ডেকে এসেছি। বাবা-মা যে-নামে তাকে ডাকতেন। আমাকে কেউ দাদা ডাকতে বাধ্য করেনি, শেখায়নি। অশোক অতএব ততটাই আমার দাদা ও ভাই যতটা সে আমার বন্ধু।

অশোকের বিষয় ভারতবর্ষের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ইতিহাস। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়েই তার পি-এইচ. ডি। এখন ওখানেই সে সহকারী অধ্যাপক। একটি জার্মান মেয়ের সঙ্গে প্রেম। দুজনে একসঙ্গে বাস করছে। হয়ত বিয়ে করবে।

অশোকের সঙ্গে নিকের দারুণ জমে গিয়েছিল। অশোকই নিককে বলেছিল দেশে ফিরে বসবাস করবে কিনা সে একেবারেই জানে না।

'আমি হাড়ে হাড়ে বিশ্ব-নাগরিক', অশোক বলেছিল, দেশে থাকতেও আমার যেমন ভাল লাগে ইংলন্ডে, জার্মানিতে, বা যেকোন অন্য দেশে বাস করতেও তেমনি। আমার শুধু একটা সর্ত: যেখানেই বাস করি না, সম্মান ও আদরের সঙ্গে বাস করব। যে-দেশ আমাকে চায় না, সেখানে বাস করব না আমি কিছুতেই।'

নিক্ ধরে নিয়েছিল অশোক ভারতবর্ষে ফিরে এসে জীবন কাটাবে না।

তাতে আমাকে নিয়ে তোমার ভয় বেড়ে গিয়েছিল আরও নিক্।

ভয়টা প্রায় আতঙ্কে দাঁড়িয়েছিল মা'র মৃত্যুর পর।

বাবা হয়ে গিয়েছিলেন একবারে একা। নিক্ মনে মনে প্রায়ই ভাবত বাবার জন্যে আমি দেশে ফিরে যাব।

'তোমাকে ধরে রাখতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই, মিতা', তুমি একদিন বলেছিলে।

'আছে' বলেছিলাম আমি। 'তুমি। তোমার প্রেম।'

'প্রেম? নিশ্চয়! কিন্তু প্রেম কি যথেষ্ট কাউকে বেঁধে রাখবার জন্যে? দেখতে পাচ্ছ না, মানুষে মানুষে সম্পর্ক টিঁকে থাকছে না, ভেঙে পড়ছে? দেখছ না এদেশে এখন বেস্ট সেলর উপন্যাসের নাম, 'রিলেশনস্, ডোন্ট লাস্ট!'

'আমি তো আমেরিকান নই।'

'আমি যে পুরোপুরি আমেরিকান!'

॥ নয় ॥

আমাদের প্রেম গভীর ছিল, কিন্তু সম্পর্ক পুরোপুরি চাপ-মুক্ত ছিল না।

সম্পর্কের ওপর সবচেয়ে ভারি চাপ ছিল নিকের ভয় আমি একদিন তাকে ছেড়ে চলে যাব।

এ ভয় থেকে মাঝে মাঝে নিক্ এমন সব ব্যবহার করত যাতে আমার মন বিগড়ে যেত।

নিকের সঙ্গে তার মার সম্পর্ক ছিল না। এখন নিকের ইচ্ছে হত মার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। মাকে মাঝে-সাঝে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে। আমাদের সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে যেতে।

আমি মহিলাকে একেবারে বরদাস্ত করতে পারতাম না। আমার চোখে কেবল তাঁর দোষগুলি ধরা পড়ত। প্রচণ্ড লোভ। অসম্ভব স্বার্থপরতা। একমাত্র পুত্র নিকের ওপরে গভীর একটা প্রাচীন বৈরিতা। আমি ভুলতে পারতাম না, নিক্‌কে ইনি শিশুকালে বর্জন করে বাবা-মার হাতে তুলে দিয়ে নিজের খুশি মত জীবন কাটিয়েছেন। কতগুলি পুরুষের সঙ্গে আমার জানবার দরকার নেই, বুদ্ধির পরিচয় শুধু এটুকু দিয়েছেন যে কারুর দ্বারা নিজের গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান উৎপন্ন হতে দেননি।

নিক্ তার মাকে এখনও মোটেই পছন্দ করে না। কিন্তু আশা করে আমি তাঁকে পছন্দ করব এবং কাছে আসতে দেব।

নিক্ শুনতে চায় আমার মুখ থেকে যে তার মাকে আমি অপছন্দ করি না।

'মা তোমাকে খুব বিরক্ত করছেনা তো ?'

'না।'

'মা'র দোষ অনেক। কিন্তু ভাল দিকও নিশ্চয় আছে। আমি দেখতে পাইনি। তুমি পাবে!'

'আমার কি দিব্যদৃষ্টি আছে?' আমি হাসি দিয়ে প্রশ্নটার হুলকে ঢেকে রেখেছিলাম।

'তুমি ভারতীয়। তোমরা সবাইকে ভালবাসতে পার। আমি মাকে কোনদিন ভালবাসতে পারিনি। পারবও না।'

'তার কারণ উনি তোমাকে ভালবাসেননি! ভালবাসা দেননি।'

'তোমাকে হয়ত দেবেন।'

'তাতে আমি খুব খুশি হব।'

তোমার বাড়তি টেনশন দেখে দেখে আমিই আবার প্রথম মনঃস্থির করে নিয়েছিলাম, নিক্।

যেদিন তোমাকে বলেছিলাম, এমন লাফ মেরে উঠেছিলে যে তোমার মাথা সীলিং-এ ধাক্কা খেয়েছিল। আমাকে এমন জোরে চেপে ধরে ঘুরপাক খাচ্ছিলে যে আমি দমবন্ধ হয়ে মরে যাচ্ছিলাম আর কি!

আমি তোমাকে বলেছিলাম, 'নিক, আমি মা হতে যাচ্ছি।'

তোমার অবাক বিস্ফারিত চোখ আর একেবারে হাঁ-করা বোবা মুখের পানে তাকিয়ে আরও বলেছিলাম, 'আজ আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। আমার পেটে তোমার সন্তান। তার দু মাস বয়স।'

পাখি জন্মাবার পর তোমার টেনশন চলে গিয়েছিল, নিক্। পাখি, আমাদের মেয়ে, আমাকে তোমার সঙ্গে বেঁধে রাখবে, তুমি একা না-পারলেও, ভেবে নিয়েছিলে তুমি।

পাখিকে আমি তার পিতার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব না, নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার প্রস্তুতি থাকলেও, তুমি নিজেকে বুঝিয়েছিলে।

কেননা, আমি ভারতবর্ষের জননী। আমি তোমার মার মত মা নই। আমি আমার মার মত মা।

ভারতীয় কালচার ও চরিত্র সম্বন্ধে তোমার রোমান্টিক শ্রদ্ধা আমাকে

অনেক সময় রাগিয়ে দিত। আমার মনে হত, তুমি বড় বেশি ইনোসেন্ট, তোমার মধ্যে সফিস্টিকেশন নেই।

আবার অনেক সময় ভালও লাগত।

জন্ম থেকেই পাখিকে তুমি স্পয়েল করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলে। তার সব কিছু তোমার নিজের হাতে করা চাই, যতক্ষণ তুমি গৃহে বর্তমান। তার ন্যাপকিন বদলান, তাকে স্নান করান, তার গায়ে অলিভ অয়েল মাখান, তার মাথা ভরতি কালো চুল ব্রাশ করা, তাকে ঘুম পাড়ান, সব কাজ তোমার।

শুধু তাকে স্তন থেকে দুধ খাওয়ান তোমার দ্বারা সম্ভব হত না, এবং তাতেই তোমার ক্ষেদের শেষ ছিল না।

'পাখির উচিত ছিল তোমার পেটে জন্মান,' আমি বলতাম। তুমি বলতে, 'খুব আনন্দের সঙ্গে পেট ফুলিয়ে বয়ে বেড়াতাম আমি পাখিকে।'

'জন্ম দেবার সময়কার যন্ত্রণাটাও বোধহয় তোমার আনন্দদায়ক হত।'

'নিশ্চয়! আমি একবারও চেঁচিয়ে উঠতাম না, সারা হাসপাতালকে চমকে দিয়ে।'

নিক্ লেবার রুমে উপস্থিত ছিল পাখি জন্মাবার সময়। আগাগোড়া আমার পাশে ছিল। আমার চীৎকারে ওর চোখে বার বার জল এসে গিয়েছিল।

ব্যথা কমে এলে একবার আমি বলেছিলাম, 'তুমি কাঁদছ কেন, নিক্! কাঁদবার কথা তো আমার। তোমার নিশ্চয় পেটে ব্যথা লাগছে না!'

নিক্ বলেছিল, 'তোমার কষ্ট সহ্য করতে পারছি না আমি।'

আমি বলেছিলাম, 'তুমি কাজে চলে যাও! আমাদের দেশে বাবাদের লেবার রুমে আসতে দেয় না। কেন দেয় না এখন বুঝতে পারছি।'

নিক্ বলেছিল, 'না। আমি থাকব। আমি দেখব আমার সন্তান কি ভাবে বেরিয়ে আসে আমাদের পৃথিবীতে।'

নিক্, তুমি এখন আর নেই। না, না, তা নয়, তুমি দৈহিক জীবন ধারণ করে আর বেঁচে নেই। দৈহিক জীবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যদি পুরোপুরি শেষ হয়ে যেত, তাহলে সভ্যতা নামক বিরাট এই বিশ্বব্যাপী ঐশ্বর্য কোনওদিন সৃষ্ট হতে পারত না। মানুষ নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছে, নিজের অমরত্বের খোঁজ পেয়েছে, তাই যুগ-শতাব্দী-মিলেনিয়াম পরম্পরায় তৈরি হতে পেরেছে সভ্যতা, সঞ্চিতও হতে পেরেছে তার ইতিহাস, গগন ভেদ করে উঁচু হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে মানুষের হাতে-মনে-মস্তিষ্কে-হৃদয়ে গড়া আদর্শ, দর্শন, জীবনবেদ।

তুমি নেই, এবং তুমি প্রচণ্ড ভাবে বিরাজ করছ, এই দ্বৈত সত্যের মধ্যে

কোনও দ্বন্দ্ব নেই, এরা পরস্পরবিরোধী কনট্রাডিকশন নয়, এই দ্বৈতের মধ্যে যে মিলন, গভীর চিরকালীন মিলন, তাই লিপিবদ্ধ, চিন্তাবদ্ধ রয়েছে আমাদের বেদ-উপনিষদ-গীতায়, যীশুখ্রীষ্টের জবানীতে, গৌতম বুদ্ধের বাণীতে।

তাই আমি তোমার মৃত্যুর মত অসহনীয় অভাবও সহ্য করতে পারছি, পারছি বয়ে বেড়াতে দিনের পর দিন।

তাই তোমাকে এখন এমন সব কথা বলতে পারছি যা জীবন্ত তোমাকে বলতে পারতাম না কিছুতেই।

তোমার সঙ্গে প্রেমে পড়তে আমার ভীষণ ভাল লেগেছিল, নিক্। প্রথম প্রেম, প্রথম প্রভাত, প্রথম পূর্ণিমা, প্রথম সমুদ্র শিহর, প্রথম প্রভঞ্জন, প্রথম চরম আকাঙ্ক্ষিত সর্বনাশ, যার আশায় বসে থাকে প্রতিটি ফুটে-ওঠা কুমারী কন্যা।

তোমার কাছে প্রথম বার শরীর সঁপে দেওয়াটাও পরম পরিপূর্ণতার ব্যথা-আনন্দের মূর্ত পরিণাম হয়ে এসেছিল আমার জীবনে। ভালবাসা দুটি নরনারীর দেহকে দুটি বন্যায় পরিণত করে দেয়, চরম উদ্বেলতার পর বন্যার দুটি সম্মিলিত যুধ্যমান ধারা এক সঙ্গে পেঁছে যায় কোনও এক অনির্বচনীয় প্লাবিত মোহনায়; দুটি শরীর যে নিজেদের মধ্য থেকে এত অমৃত এত আনন্দ বার করে আনতে পারে সৃষ্টির সেটা এক পরম মহিমা। পশুরা সঙ্গম করে। প্রেম করতে পারে না। প্রেম তো দেহ থেকে আসে না! প্রেম আসে অন্তর থেকে, অন্তর মানে মস্তিষ্ক থেকে, আর মস্তিষ্ক? সে কি আসে সেই অদৃশ্য অথচ সর্বদা অনুভূত মহাশক্তি থেকে যার চলতি নাম আত্মা?

তারপর কত শত সহস্র বার আমাদের দেহ প্রেমে সম্মিলিত হয়ে সেই প্লাবিত মোহনায় পেঁচেছে তার কোনও হিসেব নেই। পাঁচ বছরে আমরা বুঝি সময়ের প্রারম্ভ থেকে অন্তিম শেষ পর্যন্ত মিথুনে মন্হন করে এসেছি, কতো বার কতো নতুন করে পেয়েছি তোমাকে, পেরেছি দিতে তোমাকে, মানুষ না-হয়ে জন্মালে এই দ্যুতিময় পরিপূর্ণতা আমার আয়ত্তের বাইরে থেকে যেত!

কিন্তু, নিক্, এই পরিপূর্ণতার মধ্যেই বুঝি একটা শূন্যতা প্রথম এক বিন্দুর আকারে একদিন কথিত হল, এবং তিলে তিলে বেড়ে পাঁচ বছরে সে তার অস্তিত্ব এমনভাবে স্থাপন করল আমার বুকের গভীর অভ্যন্তরে যে তাকে উপেক্ষা করবার, অস্বীকার করবার উপায় আমার আর রইল না।

আমি ক্রমে ক্রমে, খুব আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম, শিক্ষা শুরু হল আমার, যে দুটি নর-নারী, স্বামী-স্ত্রী হয়েও, অথবা বুঝি স্বামী-স্ত্রী হবার জন্যেই, পরস্পরকে শুধু পরিপূর্ণ করে না, শূন্যও করে তোলে। আমার মন বুঝতে শিখল, প্রেম অমর নয়, সে একহাতে ভরে দেয়, অন্য হাতে আদায়

করে নেয় তার দেবার দাম ঃ শূন্যতা। আমরা যতই পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠি, ততখানিই একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাই।

তাই বাঁধতে হয় একের পর এক সেতু, দূরত্বকে, ব্যবধানকে ছোট করে রাখতে।

দরকার হয় সন্তানের, সংসারের, বাড়ী ঘর বিষয় আশয়ের। দরকার হয় সমাজের, সামাজিক ও ব্যক্তিগত মরালিটির, উপনিষদকে বেড়া দেবার জন্যে ডেকে আনতে হয় মনুসংহিতাকে।

পাখি নিশ্চয় মস্ত বড় সেতু হয়ে এসেছিল তোমার আর আমার মধ্যে। তুমি আরও সেতু তৈরি করতে চেয়েছিলে—বাড়ি, গভর্নমেন্ট বন্ড, করপোরেট্ স্টক, ইনসিওরেন্স, সব কিছু একত্রে, যেন এরা আমাদের বেঁধে রাখবে, প্রেমের বন্ধন হালকা হয়ে গেলেও।

আমি বুঝতে পারছিলাম, স্বামী, কন্যা, ছাড়াও জীবন থেকে, বেঁচে থাকার সুখের ওপরে, জীবন্ত থাকার আনন্দ ও পূর্ণতা গভীর ভাবে লাভ করতে হলে আমার আরও কিছু চাই।

কিন্তু কি চাই, কি তার নাম, কোথায় তার অবস্থান, তা আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছিল না।

আমি পড়াশোনার মধ্যে তার খোঁজ শুরু করেছিলাম। প্রজেক্টের জন্যে যতটুকু কাজ করা দরকার তার চেয়ে ক্রমশ বেশি কাজে আমি নিজেকে সঁপে দিচ্ছিলাম, তোমাকে বলছিলাম প্রজেক্টের কাজ বেড়ে গেছে, চাপ পড়ছে ক্রমশ বেশি।

পাখিকে দেখাশোনার জন্যে একটি পর্তুরিকান মহিলাকে তুমি নিযুক্ত করেছিলে। সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত রবিবার বাদে প্রতিদিন সিরান্দা আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে থাকছে, পাখির দেখাশোনা ছাড়াও রান্নায়, ঘর পরিষ্কারে, ঘর-কন্নায় সে হাত লাগায়।

যেটা আমি বুঝতে পারিনি, নিক্, তা হল ঃ তুমি বুঝতে পেরেছিলে আমার মধ্যে একটা অজানা বিন্দু ক্রমে ক্রমে বেশ বড় একটি শূন্যের আকার নিতে চলেছে।

।। দশ ।।

সেই প্রথম ধাক্কা খাবার ঘটনাটা আমার মনে দগ্‌দগ্‌ করছে এখন।

লন্ড্রীর জন্যে তোমার ব্যবহৃত শার্টগুলি সিরান্দাকে তুলে দিচ্ছিলাম। সাধারণত সপ্তাহে একবার সিরান্দা বেসমেন্টে গিয়ে লন্ড্রী করত। প্রায় সময় নিজেই আমাদের ও পাখির জামা কাপড় যোগাড় করে নিত। সেদিন আমার হাতে কাজ ছিল না, আমিই তাই তোমার শার্টগুলি বার করে দিচ্ছিলাম ক্লসেট থেকে।

একটা শার্টের পকেটে কয়েক টুকরো কাগজ হাতে লাগল। বার করে ফেলে দেবার সময় হঠাৎ মনে হল থিয়েটারের দুটো টিকিটের দুটি অংশ!

চোখের সামনে ধরলাম। তিন দিন আগেকার তারিখ। ব্রডওয়ে সেভেন অ্যাভিনিয়ুর 'ওনীল থিয়েটারের' দুখানা টিকিটের দুটি স্টাব।

মনে পড়ল ও দিন তুমি অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেছিলে। আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মনে পড়ল, তুমি সকালে বেরুবার সময়ই বলেছিলে, 'মিতা, আজ আমার ফিরতে রাত হবে।'

আমি হালকা ভাবেই প্রশ্ন করেছিলাম, 'অনেক রাত!'

তুমি বলেছিলে, 'তা হতে পারে।'

আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'আমি ঘুমিয়ে পড়লে, আমাকে জাগিও না।'

তুমি বলেছিলে, 'নিশ্চয়।'

ব্যাপারটা আমার মনে আর কোনও দাগ কাটেনি তখন।

এখন মনে হল, তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি, কেন রাত হবে? কোথায় যাচ্ছ? ডিনার খাচ্ছ কার সঙ্গে? জানতে চাইনি কি কারণে তুমি অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে থাকছ।

এখন, দুটো থিয়েটার টিকিটের স্টাব আমাকে একসঙ্গে আঘাত করল, কে যেন দুটো ছুরি একসঙ্গে বিদ্ধ করল আমার বুকে, আমি বোবা ব্যথায় অবশ হয়ে নিষ্পলক নিস্পন্দ তাকিয়ে রইলাম টুকরো দুটো থিয়েটার টিকিটের দিকে।

নিক, তুমিও কি তাহলে দুরন্তের পথের বুকে বয়ে চলছ?

প্রশ্নটা আমাকে তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল করেনি। ক্রুদ্ধ করেছে। যেন শূন্যতার বোঝা কমবার জায়গা শুধু আমার বুক, তোমার তাতে কোনও অধিকার নেই।

সারা দিন রাগ জমতে লাগল আমার মধ্যে, তার সঙ্গে অভিমান, অপমান, এবং দোষবোধ।

সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল তোমার বাড়ি ফিরতে সেদিন।

তোমার মুখের পানে বার বার তাকিয়ে আমি অনুসন্ধান করলাম : অন্য কোনও নারী কি তোমাকে দখল করতে বসেছে ? এমন কোনও সংকেত পেলাম না যাতে আমার সন্দেহ মজবুত হতে পারে।

তুমি রোজ যা কর, আজও তাই করে গেলে।

পাখিকে নিয়ে আধ ঘণ্টা খেলা। তারই মধ্যে সদ্যকেনা বই থেকে গল্প পড়িয়ে শোনান।

পাখিকে স্নান করিয়ে, নিজেও স্নান সেরে নিলে।

পাখি গেল. কাছে বসে তুমি ওর সঙ্গে কথা চালিয়ে গেলে।

তারপর আমাদের আহার হল। তুমি তোমার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে যেটুকু উল্লেখযোগ্য তার বিবরণ দিলে।

বললে, দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস তোমাদের নিমন্ত্রণ করেছে তাদের বার্ষিক সম্মেলনে প্রতিনিধিদল পাঠাতে। সম্মেলন হবে নাম্বিয়ায়।

আমি জানতে চাইলাম, তোমার প্রতিনিধিদলে যোগ দেবার সম্ভাবনা আছে কি না।

তুমি বললে, 'বলা যায় না। আমার খুব একটা উৎসাহ নেই।'

দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক সংকট নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলগা কথাবার্তা হল।

আমরা দুজন মিলে টেবিল সাফ করলাম। রান্নাঘরও। বাসনপত্র জলে হালকা সাফ করে ডিশ্ ওয়াশারে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ তুমিই দিলে। আমি দুকাপ কফি তৈরী করে কফি টেবিলে রাখলাম। দুজনে কফি নিয়ে বসলাম।

এতক্ষণে আমি কথাটা তুলতে পারলাম।

"ফিডলার অন্ দ' রুথা' কেমন লাগল ?"

তুমি আকাশ থেকে পড়লে না। বড় একটা অন্যায় করে হাতে হাতে ধরা পড়ে মানুষের যে-রকম অবস্থা হয় তাও তোমার হল না।

তুমি শুধু বললে, "আমি অপেক্ষা করছিলাম তোমার এই আবিষ্কারের।"

'তুমি তো জানো, তোমার ওপরে নজর রাখবার মত চোখ আমার নেই।"

তুমি বললে, 'জানি বলেই তো এত সহজে তোমার নজর এড়াতে পারি।'

"নিক্, আমরা যখন কোনও অন্যায় করি, তখন সারা পৃথিবীটাই হয়ে

পড়ে কাঁচের ঘর। কেউ না কেউ আমাদের দেখে ফেলে, ধরা না-পড়ে আমাদের উপায় থাকে না।'

'স্ত্রী ছাড়া আর কাউকে সঙ্গে নিয়ে থিয়েটারে যাওয়াটা অন্যায় ?'

'স্ত্রীর কাছে গোপন করাটা সম্ভবত ঠিক কাজ নয়।'

'গোপন করার কথা ওঠে তখনই যখন স্ত্রীর নজর আর মন স্বামীর ওপর ঘনীভূত থাকে।'

'তুমি অতি সাধারণ একটা ব্যাপার এড়িয়ে যাচ্ছ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সততা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস একমাত্র শক্ত সেতু।'

'ভালবাসা ?'

'প্রথম প্রখরতা মন্দ হয়ে আসবার পর তার নাম সততা ও পারস্পরিক বিশ্বাস।'

'তুমি যাকে সততা ও পারস্পরিক বিশ্বাস বলছ তার মানে লয়্যালটি ও ফেইথফুলনেস ?'

'নিশ্চয়।'

'মিতা, তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে যে আমি অন্য কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে···?'

'সন্দেহ ? না, সন্দেহ এখনও হচ্ছে না। এমন খুবই হতে পারে যে তোমার থিয়েটার সঙ্গী ছিল কোনও পুরুষ বন্ধু।'

'অথবা এমন কোনও ধনবান কেউ যার কাছ থেকে আরবান কোয়ালিশনের জন্যে আমি মোটা একটা অনুদান তুলে আনবার চেষ্টায় আছি।'

'হতে পারে বৈ কি ?'

'তবে ?'

'আমাকে কথাটা একেবারে না-জানানোর মধ্যে সন্দেহ না হলেও, প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়।'

'যাবার কি যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে ? আমার কর্মজীবনের দৈনন্দিন কাহিনীর বিবরণ শোনবার উৎসাহ অনেক দিন তোমার চলে গেছে।'

'নিক্, আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম, নাটকটা তোমার কেমন লাগল ?'

'মিতা, এক একটা প্রশ্ন অনেক অনুচ্চারিত প্রশ্নের প্রতিনিধি হয়ে আসে।'

'নিক্, এক একটা অনুত্তর অনেক অভিযোগের প্রতিনিধিত্ব করে।'

নিক্ উঠে সরাসরি চলে গেল বসবার ঘরে। একটু পরেই ফিরে এসে আমার হাতে দুটুকরো কাগজ গুঁজে দিল। দেখতে পেলাম, থিয়েটার টিকিটের বাকী দুটো অংশ।

এবার বিস্ময়ের পালা আমার।

'সে কি! তুমি থিয়েটারে যাওনি ?'

'তার প্রমাণ তো তোমার হাতেই !'

আমি নির্বাক বিস্ময়ে নিজের পানে তাকিয়ে।

'তোমাকে সতর্ক করে দেবার সময় এসেছে মনে হচ্ছিল, মিতা।'

'কি বিষয়ে ?'

'আমাকে নিয়ে তুমি যদি পুরোপুরি সন্তুষ্ট না থাকো, আমার কাছ থেকে তা লুকোবার উপায় তোমার নেই।'

আমি অপলক নিকের মুখে তাকিয়ে। আমার দুচোখের জল গাল বেয়ে নেমে আসছে।

নিক্ বলল, 'তোমার ঠাণ্ডা হয়ে আসবার কারণটা আমি জানতে পারিনি, মিতা ?'

আমি তখন চোখ মুছে সহজ হতে পেরেছি।

'ঠাণ্ডা আমি হইনি, নিক্, হইনি। তোমাকে আমি ভালবাসি। চিরদিন ভালবাসব।'

'তবে ?'

'তবে আমার আজকাল মনে হচ্ছে, মানুষের পরিপূর্ণতা প্রেমের বাইরে হাত বাড়ায়, কি চাই না জেনে, কোথায় পাবে তাও না-জেনে। মনে হচ্ছে। ভালবাসা যতই গভীর হোক না কেন, তার উত্তাপ কমে আসতে বাধ্য। ভালবাসা যখন দৈনন্দিন সাংসারিকতার দেওয়ালে আবদ্ধ হয়ে যায়, বিছানায় যখন তার একমাত্র, অথবা প্রধান প্রকাশ, তখন সেটা হয়ে ওঠে অভ্যেস, তার আদি উত্তেজনা যায় হারিয়ে। তুমি আর আমি দুজনের অভ্যেস হয়ে যাচ্ছি, নিক্। এ ব্যাপারটা আমাকে ইদানীং বড্ড ভাবাচ্ছে।'

নিক বলল, 'তোমার দার্শনিক মনের নাগাল আমি সব সময় পাই নে। অত শিক্ষা আমার নেই, তোমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি শূন্যতার ঔদাসীন্যে গভীর, আমি তার সঙ্গে সম্যক পরিচিত নই। তবু কিছু দিন ধরে আমি দেখে আসছি, মিতা, তোমার মধ্যে একটা চঞ্চলতা, কি যেন তোমাকে ভেতরে ভেতরে তাড়না করছে। প্রেম করবার সময় তুমি আগের মত উল্লাসে পাগল হয়ে আমার কাছ থেকে ঝড়ের শেষ হাওয়াটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিতে চাও না, হঠাৎ প্রশ্নকাতর চোখে আমার মুখে কি যেন খুঁজে বেড়াও। তুমি কি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছ, মিতা ?'

আমি উঠে গিয়ে এতক্ষণে তোমাকে জড়িয়ে ধরেছি। তোমার মাথা আমার বুকে চেপে ধরে রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠেছি, 'না, না, না।'

বলেছি, 'তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, নিক্।'

তুমি আমাকে কোলে তুলে বিছানায় নিয়ে গেছ।

মিনিট পঁচিশ পরে তুমি বলেছিলে। 'মিতা, আমার কাছ থেকে তুমি দূরে সরে যাবার আগে দেখবে আমি একেবারে সরে গেছি জীবন থেকে।'

আমি তোমার কথাগুলি খুব হালকা ভাবে নিয়েছিলাম।

তাই বলতে পেরেছিলাম, অথবা আমি। পাদ্রীর সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের বিয়ে হয়নি। তবু সেই মন্ত্র আমাদের মনে আছে - 'টিল ডেথ ডু আস পার্ট'।'

অনেক, অনেক বারের মত আরও একবার আমাকে একই সঙ্গে পরিপূর্ণ ও নিঃস্ব করে দিয়ে তুমিও পরিতৃপ্ত পরিশ্রান্ত সিংহের মত নিস্তেজ হয়ে বিছানায় স্তিমিত দেহ নিয়ে পড়েছিলে কিছুক্ষণ। আমি সেই রিক্ত সময়টুকুতেই অলস মনে নিজেকেই প্রশ্ন করছিলাম, সত্যি কি প্রেমে ভাঁটা পড়েছে? দেহমনের অন্তস্তল থেকে জবাব পাচ্ছিলাম, না, পড়ে নি। আমি এখনও গভীরভাবে ভালবাসি তোমাকে, নিক্, তোমার হাতের কারিগরি এখনও আমার প্রতিটি রোমকে জাগিয়ে তোলে, শরীরের কোন গভীর থেকে কামনার ঢেউ উঠে আসে, আছড়ে পড়ে দেহের সৈকতে সৈকতে। তুমি ছাড়া অন্য কোনও পুরুষ আমার জীবনে কোনওদিন আসতে পারে, এ কথা আমি ভাবতে পারি নে।

তবু, নিকলস ব্রুটাস টমসন, তবু, আমার কাছে আর একটা সত্যও ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে: কোনও পুরুষের সাধ্য নেই কোনও নারীকে সার্বিক পরিপূর্ণতা দেবার। কোনও নারীর শক্তি নেই কোনও পুরুষকে পুরোপুরি পূর্ণতা দেবার।

আমি বুঝতে শিখেছি, শিখছি, সন্তোষ ও আনন্দ সংগ্রহ করতে হয় প্রথমত আমাদের নিজস্ব অভ্যন্তর থেকে; তুমি পারবে না চিরদিন আমাকে 'সুখী' রাখতে যদি-না আমি আমার ভেতর থেকে সুখের আসল সুধা তুলে আনতে পারি, পারব না আমি তোমাকে আনন্দিত রাখতে যদি-না আনন্দ তোমার নিজের অন্তর থেকে তুমি সংগ্রহ করতে পার।

আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। হঠাৎ তুমি উঠে বসলে। আমার বুকের ওপর মাথা রেখে বললে, 'মিতা, আমাদের ভালবাসায় ভাঁটা আসবার আগেই আমি মরে যেতে চাই।'

।। এগার ।।

শেষ পর্যন্ত তাই হল, নিক্।

আমাদের প্রেমে ভাঁটা আসবার সুযোগ না দিয়ে তুমি নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে, চিরকালের জন্যে। আমাকে রেখে গেলে ভরে তোমার হঠাৎ-সমাপ্ত চির-অসমাপ্ত জীবনের অপার রহস্য দিয়ে। আমি যতদিন বেঁচে থাকি বার বার ভাবব তুমি বেঁচে থাকলে কি রকম হত তোমার জীবন, আমার জীবন, আমাদের জীবন, আমাদের মেয়ে পাখির জীবন।

তুমি হাজার প্রশ্ন হয়ে জড়িয়ে থাকবে আমাকে যতদিন আমি বাঁচব। সে প্রশ্নগুলি হয়ে দাঁড়াবে আমাদের মধ্যে বন্ধনহীন গ্রন্থি। হয়ত তোমার শক্ত পৌরুষ কৃষ্ণ বাহুবন্ধনের চেয়েও কখনও দৃঢ়।

নিক্, আমি নিঃশেষ হয়ে যাব না তোমার অভাবে।

জীবন নিশ্চয় মৃত্যুর চেয়ে বড় প্রমাণিত হবে, যেমন হয়ে আসছে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে। হয়ে আসছে দিন দিন, প্রতিদিন।

আমি নিশ্চয় আবার ভালবাসব। হয়ত আবার বিয়ে করব। পাখিকে মানুষ করতে গেলে পিতৃপ্রতিম পুরুষের দরকার হবে। পাখিকে নিজের মেয়ের মত গ্রহণ করবে এমন কোনও পুরুষ হয়ত আমার জীবনে আসবে।

মৃত্যুর চেয়ে জীবনকে বড় হতেই হবে। তবু, নিক্, তবু তুমি থাকবে আমার মধ্যে যতদিন আমি বেঁচে থাকব, থাকবে জীবিত হয়ে। মৃত হয়ে নয়, তোমার জীবন্ত স্বামিত্ব ও বন্ধুত্ব, আমার একমাত্র সন্তানের জীবন্ত পিতৃত্ব বেঁচে থাকবে আমার মধ্যে যতকাল বেঁচে থাকব আমি।

তাই বুঝি, নিক্, তোমার অভাবে আমি কাঁদছি না, কান্না আমার আসছে না।

উৎপল মুখার্জি তাঁর ছেলে ও মেয়ে, অশোক ও পারমিতা, দুজনকে এক সঙ্গে কাছে ডেকে পত্নীর শেষকৃত্য বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন।

"তোমাদের মা ও আমি দুজনের একজনও প্রচলিত বিচারে 'ধার্মিক' ছিলাম না। পুজো আচ্চা আমাদের বাড়িতে বিশেষ কোনওদিন হয়নি। লক্ষ্মীর আসন পাতেননি তোমাদের মা। আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে তাঁকে শিবরাত্রি করতে দেখেছি, শুধু আমার মঙ্গল হবে এ জন্যে। সত্যনারায়ণ বা শনিপুজো আমাদের বাড়িতে কবার হয়েছে আমি মনে করতে পারব না। আত্মীয়দের বাড়িতে সত্যনারায়ণের পুজোতে সর্বাণী কখনও-সখনও গেছে, আমি কদাচিৎ। তবে, হ্যাঁ, 'তাঁকে মুশকিল-আসান' ব্রতে যোগ

দিতে দেখেছি। সেটাও আমাদের তিনজনের 'মুশকিল' আসান করবার জন্যে। সংস্কার সব মানুষেরই কিছু-না-কিছু থাকে। তোমাদের মা শনিবারে কোনও বড় কাজ কখনও করতেন না। যাত্রা ছিল একেবারে নিষেধ। কিন্তু হাঁচি, টিকটিকি এসব নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা ছিল না। আমি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যা উচিত তাই করবার পক্ষপাতী। জীবনে সব সময় রেশন্যাল হওয়া যায় না। আমাদের প্রবৃত্তিগুলি খুব একটা রেশন্যাল নয়। রাগ, হিংসা, অভিমান অনেক সময় যুক্তির বাইরে চলে যায়। প্রেম ব্যাপারটা রেশন্যাল কিনা তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে।"

"তুমি কি বলবে আমরা জানি, বাবা" পারমিতা পিতার বক্তৃতার লতাটাকে টপ করে কেটে দিল।

উৎপল মুখার্জি এক মুহূর্তের জন্যে বোবা হয়ে গেলেন।

অশোক বলল, "মা চলে গেছেন। তাঁর শরীর নিয়ে কি করা হবে না-হবে তার বিচার তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত।"

"শুধু শরীর নয়, আত্মা বলেও একটা ব্যাপার আছে।"

"আমাদের মার আত্মা আমাদের কাছে সজীব, বাবা। আমরা মার মৃত্যুকে মেনে নিতে রাজি নই, বাধ্য নই। মা-বেঁচে নেই কথাটার মানে হয় না যে মা নেই। মা আছে, থাকবে।"

উৎপল মুখার্জি বললেন, 'মিতা, তুমি দর্শন পড়েছ বলে এ কথা বলতে পারছ। আমি দর্শন না পড়েও তাই অনুভব করছি।'

অশোক বলল, 'মিস্ত্রি হলেও আমিও তোমাদের অনুভবের সমান শরিক।'

এবার উৎপল মুখার্জি প্রসঙ্গে এলেন, 'আমি বরফ এনে তোমাদের মার দেহ অন্তত পুরো একদিন এ বাড়িতে রাখতে চাই। তাঁকে সুন্দর করে তোমরা সাজিয়ে দাও, তিনি সাজতে খুব ভালবাসতেন, জানতেনও। অনেক অনেক ফুলের ব্যবস্থা কর। রজনীগন্ধা ছিল তাঁর প্রিয়তম ফুল—তা ছাড়া গোলাপ, মরসুমি ফুল, গাঁদা যা সংগ্রহ করা যায়। পাঁচ মণ বরফের জন্যে হরনাম সিংকে আমি পাঠিয়েছি ওকলায় এক বরফের কারখানায়। রাজরাণীর মত তোমাদের মার দেহ বিরাজ করুক একটা পুরো দিন এ বাড়ীর বৈঠকখানায়। আমরা সারা রাত তার দেহের পাশে বসে গান গাইব, কবিতা পড়ব, গীতা উপনিষদ থেকে শ্লোক পড়ব।"

পারমিতা উৎসাহ পেয়ে বলল, 'জানো বাবা, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু নিয়ে লেখা কবিতা, গান, দর্শন এখন আমেরিকায় বেশ কদর পাচ্ছে। মৃত্যুকে ওরা পরম দুশমন্ মনে করে এসেছে এতকাল, মৃত্যুর কথা উচ্চারণ করতে চায়নি, ভাবতে চায় নি। এখন হাজার হাজার পুরুষ নারী নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায় মাস-বছর কাটাতে বাধ্য হচ্ছে নার্সিং হোমে, ওল্ড এজ হোমে, হাসপাতালে,

অথবা বাড়িতে। মৃত্যুর মুখোমুখি অথবা অদূরে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার প্রয়োজন বোধ করছে অনেকে। অথচ ওদের কাব্য সাহিত্য দর্শনে মৃত্যুর শ্যামসমান চেহারার চিহ্নমাত্র নেই। তাই অনেকে উপনিষদ, গীতা এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শিখতে চাইছে মৃত্যুকে কি ভাবে দুবাহু বাড়িয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।'

উৎপল মুখার্জি বললেন, 'আত্মীয়-বন্ধুদের খবর দিয়ে দাও। যাঁরা সারা রাত আমাদের এখানে কাটাতে ইচ্ছুক, হরনাম সিং তাঁদের নিয়ে আসবে, কাল সকালে পেঁছে দেবে নিজেদের বাড়িতে। আমার বন্ধু হিমাদ্রি ঘোষ আসবে, তার কণ্ঠে গীতা উপনিষদের শ্লোক শুনতে তোমাদের ভাল লাগবে। রবীন্দ্র সঙ্গীতে যাদের দক্ষতা আছে তাদের বিশেষ করে নিমন্ত্রণ কর।'

দুজনই বলল, করা হবে।

উৎপল মুখার্জির আসল বক্তব্য তখনও উত্থাপিত হয়নি।

"তোমাদের মা এবং আমি দুজনেই শ্রাদ্ধ ব্যাপারটা খুব অপছন্দ করে এসেছি। আমার বাবা ও মার শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে আমি দেখেছি সব ব্যাপারটা পুরোপুরি আনুষ্ঠানিক। প্রিয়তম ব্যক্তির আত্মাকে প্রেত বলে মেনে নিতে আমার মন রাজি হয়নি। আমার বাবা মার শ্রাদ্ধ করবার সময় আমি স্থির করেছিলাম, আমার ও তোমাদের মার শ্রাদ্ধ করা হবে না। সর্বাণীর তাতে পুরোপুরি সম্মতি ছিল। আমার ইচ্ছে শ্রাদ্ধ না করে একাদশ দিনে একটি প্রার্থনা-আসর বসবে, আজ রাত্রের অন্য সংস্করণ। এ বিষয়ে তোমাদের মতামত জানতে চাই।'

পারমিতা বলল, 'তোমার মতই আমার মত এ বিষয়ে।'

অশোক বলল, 'কাকা, মামা, পিসিমা দুঃখ পাবেন।'

উৎপল মুখার্জি বললেন, 'শুধু দুঃখ নয়, কেউ কেউ রাগও করবে। তুমি নিজের মতটা আমাকে জানাও। সর্বাণী আমার স্ত্রী, এবং তোমাদের জননী। তোমাদের বাদ দিয়ে তার বিশেষ কোনও অস্তিত্ব ছিল না। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রধানতম বন্ধন তোমরা। সুতরাং আমার মত আমি তোমার ওপর চাপাতে চাই নে।'

অশোক বলল, 'তুমি যে-কারণ দেখিয়ে শ্রাদ্ধ করতে চাইছ না তার ওপরে বলার আমার কিছু নেই। শুধু সংস্কার বলে প্রাচীনকে মেনে চলতে হবে এমন কোনও মানে নেই। আমরা তো আজকাল সিভিল ম্যারেজ দিব্যি মেনে নিচ্ছি। সপ্তপদী না করেও যদি হিন্দু ছেলেমেয়েদের বিয়ে হতে পারে, প্রার্থনা করে আত্মার বিমুক্তি কামনা করা কেন চলবে না?'

সর্বাণীর মুখের ওপর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তির যে নির্মল গভীর প্রলেপ নেমে এসেছিল, সাজিয়ে গুছিয়ে আনবার পর দেখা গেল তার ওপর সকালের

প্রথম রোদের মত একখানি হালকা আলোর আবরণ এসে পড়েছে। প্রশান্তির সঙ্গে মিলেছে অপূর্ব এক পলক হাসি। তৃপ্তির হাসি নয়, ব্যঙ্গের হাসি নয়; একটুকরো আনন্দের হাসি। হাসির ছোট্ট রাঙন ঢেউখানি ওষ্ঠাধরে চিরস্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে; সারা নিদ্রিত মুখখানায় ছড়িয়ে পড়েছে তার আভা।

সারা রাত সর্বাণীর দেহ নরম থেকেছে। উৎপল মুখার্জি বার বার তাঁর বাহুতে, গালে, গলায় হাত লাগিয়ে দেখেছেন, দেহ পাথর হয়ে যায়নি।

হয়নি হিম-শীতলও। খানিকটা উষ্ণতা লেগে রয়েছে সর্বাণীর দেহে সারা রাত।

সকাল ৯টায় বৈদ্যুতিক শ্মশানে দেহ নিয়ে যাবার কথা।

ভ্যান এসে গেল আটটায়। আত্মীয়-বন্ধুরা কেউ কেউ সকালে বাড়ি না গিয়ে শ্মশানে গেলেন। কেউ কেউ এলেন নিজেদের বাড়ি থেকে।

বৈদ্যুতিক শ্মশানের প্রাসঙ্গিক কাজকর্ম সম্পন্ন হতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগল না।

শ্মশানের ভারপ্রাপ্ত লোকেদের উৎপল মুখার্জি বললেন, 'আমি শুধু আমার স্ত্রীর আঙুল থেকে একটা আংটি খুলে নেব। বাকী যা ওঁর শরীরে আছে সবশুদ্ধ পোড়ান হবে।'

একজন বলল, 'পুজো আচ্চা?'

উৎপল মুখার্জি বললেন, 'দরকার নেই। যা করবার সব হয়ে গেছে।'

'এমন দামি সব শাড়ি, শাল...'

'সব সঙ্গে যাবে।'

আত্মীয়-বন্ধুরা সকলে শ্মশানঘরে সারি-সারি চেয়ারে বসে রয়েছেন।

কাঠ দিয়ে বৈদ্যুতিক চিতা তৈরী করা হয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ের সংকেতে উৎপল মুখার্জি এসে বসলেন সর্বাণীর পাশে। গালে, মাথায় দিলেন হাত বুলিয়ে। অপলক কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন সেই হাসিরশ্মিতে স্তিমিত উজ্জ্বল অপূর্ব প্রশান্ত মুখখানার পানে।

অনুচ্চারিত ভাষায় বললেন, 'যাও, সর্বাণী। আমরা সবাই তোমাকে সাদর বিদায় দিচ্ছি। তুমি এবার এসো।'

সহসা বৈদ্যুতিক চুল্লীর মুখ খুলে গেল।

উৎপল মুখার্জি দেখলেন, প্রচণ্ড আগুন লেলিহান গৌরবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সর্বাণীর দিকে।

তাঁর কণ্ঠ থেকে একটা গভীর নিদান বেরিয়ে এল, 'আহা! আহা!'

সে নিদান শুনে চমকে উঠল আত্মীয়-বন্ধুরা।

ভয় পেল, উৎপল মুখার্জি বুঝি এবার ভেঙে পড়লেন!

কিন্তু তাকিয়ে দেখল, উৎপল মুখার্জির মুখে চোখে সেই মহান্ লেলিহান

আগুনের আভা লেগে রয়েছে।

অশোক আর পারমিতা একসঙ্গে বুঝতে পারল, তাদের পিতা বলছেন, 'এমন আগুন নাহিলে তোমাকে ধরিবে কেবা ?'

॥ বার ॥

নিকলস টমসনের মৃত্যু পারমিতাকে বার বার ধাক্কা মেরে বুঝিয়ে দিল পশ্চিমী মানুষেরা কি নিদারুণ ভয় ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মরণকে দূর করে দিয়েছে জীবনের পরিধি থেকে।

এদেশের মানুষ সাধারণত মরে হাসপাতালে অথবা নার্সিং হোমে। গুরুতর অসুস্থদের খোঁজ-খবর নিতে সন্তানরা, বন্ধুরা, আত্মীয়েরা কখনও কখনও হাসপাতালে আসেন, অনেকে ফুল পাঠান, কার্ড পাঠান।

আমরা যেমন প্রতি মুহূর্ত পাহারা দি অসুস্থ প্রিয়জনকে, এরা তা করে না। এদের সময় নেই, প্রয়োজন নেই, ইচ্ছে নেই, নিয়ম নেই।

পারমিতার নিক্ হাসপাতালে যাবার সময় পায় নি। ঘুমের মধ্যে নিজের ঘরে, নিজের শয্যায় তার মৃত্যু ঘটেছে।

অ্যাম্বুলেনসের লোকেরা দেহ নিয়ে চলে গেল হাসপাতালে। আইন দাবি করে, হাসপাতাল বা সরকারি অনুমোদন-প্রাপ্ত নার্সিং হোমে মৃত্যু না হলে, মৃতদেহকে পোস্ট মর্টেম করতে হবে।

মৃত্যু হাসপাতালে হোক, গৃহে হোক, রাস্তায় হোক, মৃতদেহকে রেখে দেওয়া হবে মর্গে।

মর্গ থেকে সোজা চলে যাবে ফিউনারেল হোমে।

মৃতদেহকে ফিউনারেল হোমে পাঠাবার ব্যাপারটা পারমিতার জানা ছিল। নিজেকে এ কাজ করতে হবে এটা ছিল চিন্তা-ভাবনার বাইরে।

অশোককে বলেছিল পারমিতা, 'আমি চেয়েছিলাম নিক্‌কে সাজিয়ে দেব, যেমন আমরা সাজিয়েছিলাম মাকে। আমি চেয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত নিকের শরীর স্পর্শ করে থাকব আমি, যেমন আমরা স্পর্শ করে থেকেছিলাম আমাদের মায়ের শরীরকে। মৃত্যুর সঙ্গে এ দেশের নিষ্ঠুর নৈর্ব্যক্তিক ব্যবহার আমার পক্ষে সহ্য করা বড় কঠিন।'

তবু সহ্য করতে হয়েছিল।

নিকের নিজের লোক বলতে বিশেষ কেউ ছিল না। মাতামহ-মাতামহী বিগত হয়েছিলেন ; মামা মাসিদের সঙ্গে নিকের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

কিছুটা সম্পর্ক ছিল এক মামাতো ভাই ও তার স্ত্রীর সঙ্গে। তবু পারমিতা বেশ কিছু আত্মীয়দের টেলিফোনে খবর দিয়েছিল।

ফিউনারেল হোম ঠিক করতে হল অশোককে, নিকের মামাতো ভাই-এর সাহায্য নিয়ে।

পারমিতা ঠিক করল, নিককে কবর দেওয়া হবে না। বৈদ্যুতিক শ্মশানে নিকের দেহকে পাঠান হবে ফিউনারেল হোম থেকে।

ফিউনারেল হোম-এর পরিচালক প্রথমেই জানতে চাইল কতো টাকার মধ্যে সব ব্যবস্থা করতে হবে। চলনসই মধ্যবিত্ত ভাবে সারতে লাগবে আড়াই হাজার ডলার। তার ওপরে যত উঠবে তত বিদগ্ধ হবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা।

অশোক বলল, 'আমাদের বাজেট তিন হাজার ডলার।'

লোকটা অখুশি হল না। তারপর বলল, 'নিউইয়র্ক শহরে ফিউনারেল সার্ভিস করতে হলে ঐ বাজেটে হারনেস ছাড়া উপায় নেই। নিউ জার্সি, লং আইল্যান্ড বা নিউইয়র্ক রাজ্যে শহরতলীতে মোটামুটি ভাল গির্জা পাওয়া যেতে পারে।'

লং আইল্যান্ডের একটা গির্জাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল। নিউইয়র্ক শহর থেকে ৪০ মাইল।

ফিউনারেল হোমে শবদেহের পাকস্থলী পুরোপুরি বাদ দিয়ে, শরীরটাকে 'বাম' করা হয়। পারমিতা অশোক মারফৎ নিকের একটা ভাল স্যুট পাঠিয়েছিল। সেই স্যুট পরিয়ে, মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়িয়ে, কফিনের মধ্যে নিককে শোয়ান হয়েছিল। গভীর নিদ্রা নিকের মুখে, কিন্তু মুখের বর্ণ পাংশু, পরিষ্কার বোঝা যায় ঔষধপত্র দিয়ে শরীরটাকে ধরে রাখা হয়েছে, পচতে দেওয়া হয়নি।

মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে ফিউনারেল সারভিস।

ফিউনারেল হোমই গির্জার নির্দিষ্ট অংশের একটা হল ঘরকে সুন্দর করে সাজিয়েছে। ফুলে ফুলে ঘরের সে অংশটা রংবাহার যেখানে কফিনে নিক্ শুয়ে আছে। নিকের ও পারমিতার সহকর্মীরাই যোগ দিতে এসেছে বেশি সংখ্যায়। অশোক গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে পারমিতা ও পাখিকে। নিকের আত্মীয়দের মধ্যে সেই মামাতো ভাই এবং তার স্ত্রী।

পাখি পুরো সার্ভিসের সময় একটা কথাও বলে নি। ভয়ে, বিস্ময়ে, দুঃখে জড় হয়ে মার হাত ধরে তার গায়ে গা লাগিয়ে বসেছিল।

ফিউনারেল হোম দ্বারা নিযুক্ত একটি বছর ত্রিশেকের পাদ্রী বাইবেল থেকে কিছুটা পাঠ করলেন, নিকলস ব্রুটাস টমসনের জীবন সম্বন্ধ দু-চারটি ভাল কথা বললেন, তারপর জীবনমৃত্যু নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি ধর্মীয় বক্তৃতা দিলেন।

সার্ভিস শেষ হল।

এবার উপস্থিত সবার মৃতদেহকে শেষ দর্শনের পালা।

প্রথম পংক্তিতে বসেছিল নিকের কয়েকটি সহকর্মী। তারাই প্রথম একে একে উঠে গিয়ে কফিনের মধ্যে শায়িত নিকের মুখে চোখ রেখে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

পাখিকে পারমিতা আগে থেকে বলে রেখেছিল কি করতে হবে।

পাখি সে সব শেখান কথা সব ভুলে গেছে।

কিছুতেই সে বাবার কফিনের কাছে যাবে না। শক্ত হয়ে বসে রইল মার হাত ধরে।

পারমিতা বার বার বলল, বার বার বলল অশোক।

পাখির এক জবাব, আমি বাবার কাছে যাব না।

শেষ পর্যন্ত পাখিকে অশোকের কাছে রেখে পারমিতা একাই এগিয়ে গেল।

দাঁড়াল নিকের মৃতদেহের কাছে।

মনে হল, অপরিচিত কোনও পুরুষ চোখ বুজে শুয়ে আছে কফিনের মধ্যে।

তাকে দেখে পারমিতার বিশেষ কোনও অনুভূতি হল না।

সব ব্যাপারটাই তার কাছে অলীক, অজানা অচেনা মনে হচ্ছিল। এ আমাদের মৃত্যু নয়, সে বলছিল বার বার নিজেকে, এ মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই, এ মৃত্যুর মধ্যে ভালবাসা নেই, প্রেম নেই, সমাদর নেই।

পারমিতা দেখতে পেল কফিনে শায়িত নিঃসাড় দেহ তার কাছে অর্থবহ নয়, তার সুরভিত হলদেটে মুখ থেকে কোনও অব্যক্ত বাণী আসছে না বেরিয়ে দৈহিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও এ শরীরটা তার কাছে পরিচিত নয়, এ নয় সেই শরীর যার মধ্যে নিকলস ব্রুটাস টমসন বিয়াল্লিশ বছর সঞ্জীবিত ছিল।

পারমিতার বুক থেকে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। দুই চোখ, বুক, মন তার একেবারে শুকনো।

এগিয়ে যাবে এমন সময় শাড়ির আঁচলে টান পড়ল।

দেখল, পাখি কখন এসে নিঃশব্দে পাশে দাঁড়িয়েছে।

॥ তের ॥

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।

বসন্তবিহারে তার বাড়ির দক্ষিণ কোণে নিজস্ব আপিস-ও-স্টাডি ঘর। অন্য ঘরগুলির তুলনায় ছোট, ষোল বাই বিশ ফিট আয়তন। দেওয়াল ঘিরে বই-এর র‍্যাক। এখানে আইনের বই-এর সংখ্যা কম। আইনের বই এবং বছরের পর বছরের চামড়ায় বাঁধান ল' রিপোর্ট পুব দিকের প্রশস্ত দপ্তর ঘরে, এবং সুপ্রিম কোর্টের দেওয়াল ঘেরা জমির ওপর অ্যাডভোকেটদের জন্যে নির্দিষ্ট আপিস-বাড়িতে তার নিজস্ব ভাড়া-করা আপিসে।

নিরিবিলি সারা বাড়িটাই। বাসিন্দা বলতে রাজীব মাথুর ও কন্যা ভাস্বতী। বাকি সব তো ভৃত্য রামদাস, লছমী, ড্রাইভার বাহাদুর সিং অধিকারী।

নিশ্চুপ নিরিবিলিটা এখন মাঝে মাঝে রাজীব মাথুরকে পেয়ে বসে। আমি কি কোনও অন্ধকার মরুতে বন্দী হয়ে রয়েছি? সে প্রশ্ন করে নিজেকে।

সারাদিনের পর কাজের সময় নিঃশব্দ একাকিত্বটা আশে-পাশে লুকিয়ে থাকে। কখনই চলে যায় না অনেক দূরে আজকাল। কিছুটা দূর থেকে উদাসীন নজর রাখে রাজীব মাথুরের ওপর।

একা হলে সে এসে জমিয়ে বসে মনে, মাথায়, বুকে।

সকালে, রাত্রে, ছুটির দিনে দ্বিপ্রহরেও, অপরাহ্নেও।

আজ, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ এর সকালে রাজীব মাথুরের চোখ পড়ল স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার পার্সোনাল কলমে একটি বিজ্ঞাপনে।

চোখ সরল না। বার বার বিজ্ঞাপনটি পড়ল রাজীব মাথুর।

ললিতার মৃত্যুর পর পুনরায় বিয়ের কথা ভাবেনি রাজীব মাথুর। ভাবতে দেয়নি নিজেকে। এখন, এই ইদানীং কালে, নিজের একাকিত্বের ভার অনুভব করে মাঝে মাঝে আবার বিবাহের কথাটা সে ভাবতে দিয়েছে নিজেকে। ভাবনা বিশেষ এগোয়নি।

তার সব চেয়ে বড় কারণ, রাজীব কিছুদিন হল বুঝতে পারছে, গভীর সামাজিক পরিবর্তন। সে দিন আর নেই যখন একটা পুরুষ বয়স-আর-দায়দায়িত্ব নির্বিশেষে, বিয়ের পর বিয়ে করে যেতে পারত! এখন এসেছে বিবাহ-বিচ্ছেদের যুগ। আদালতে হাজার হাজার বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলা জমা হয়ে রয়েছে। রাজীব নিজেই দিল্লী হাইকোর্টে তিন বছরে সাতটি মামলা করেছে বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত।

এখন মাঝ বয়সী বিপত্নীক পুরুষ, সন্তানের পিতা, সহজে বিবাহিত হতে পারে না।

কুমারী মেয়েরা বিপত্নীক অথবা বিবাহ-বিচ্ছিন্ন পুরুষকে সহজে বিয়ে করতে চায় না, যদি-না প্রেম এসে শক্ত এক সিঁড়ি তৈরি করে দেয়।

বিপত্নীক বা বিচ্ছিন্ন-বিবাহ পুরুষ যদি সন্তানের জনক হয়, তাহলে দ্বিতীয় বিবাহের পথ আরও সংকীর্ণ।

সেকাল আর নেই যখন আত্মীয়-স্বজনরা ঘটকালি করে বিয়ের রাস্তা বানাত। অতএব এখন পাত্র পাত্রীর সন্ধান করতে হয় খবরের কাগজের বিস্তীর্ণ কলমে। পাত্র পাত্রী বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা দখল করে নেয় বড় বড় সংবাদপত্রগুলির প্রতি রবিবারে।

কিছুদিন হল রাজীব মাথুর রবিবারের সংবাদপত্রগুলিতে পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপনে চোখ বুলিয়েছে। হিন্দুস্থান টাইমস এবং টাইমস অব ইন্ডিয়া। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে প্রতি রবিবার অন্তত দেড় হাজার বিজ্ঞাপন ছাপা হয় এই দুটি পত্রিকাতেই। সারা দেশের সব ভাষার পত্রিকাগুলিকে এক সঙ্গে ধরলে, মাসে এক লাখ পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় নিশ্চয়।

রাজীব লক্ষ্য করেছে, কন্যা পক্ষ থেকে পাত্র সন্ধানী বিজ্ঞাপনে ক্বচিৎ কখনও বিচ্ছিন্ন-বিবাহ পুরুষে আপত্তি নেই বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সেই পুরুষকে নিঃসন্তান হতে হবে।

কোনও পক্ষ নিজের পরিচয় দিয়ে সরাসরি বিজ্ঞাপন দেয় না। বিজ্ঞাপনগুলি নৈর্ব্যক্তিক, ইম্‌পারসোনাল, গুজরাতী সুদর্শন এম-বি-এ পাত্র, ২৬, বিদেশী কোম্পানীতে বড় মাইনের চাকুরে, সুন্দরী গুণবতী, কায়স্থ, কলেজ গ্র্যাজুয়েট ১৮-২২ বছরের পাত্রী চাই।

এই অন্ধ সমাজের মাধ্যমেই বুঝি আজকাল বেশির ভাগ উচ্চ ও মধ্য মধ্যবিত্ত যুবক-যুবতীর বিয়ে হয়ে থাকে।

১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার বিজ্ঞাপনটা রাজীব মাথুরকে শক্ত আকর্ষণ করল। ৩৫ বছরের একটি 'ইন্ডিয়ান' মহিলা। গুজরাতী নয়, রাজস্থানী নয়, তামিল-তেলেগু-পাঞ্জাবী-হিন্দু-বাঙ্গালী নয় শুধু 'ভারতীয়'।

মার্কিন নাগরিক। বিধবা। সন্তানের জননী।

প্রার্থী পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সম্ভব হলে বিবাহ।

রাজীব মাথুর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ চিন্তায় মগ্ন রইল।

ললিতার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সামাজিক প্রথায়, সম্বন্ধ করে বাবা-মা অগ্রণী হয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। বাবারই এক বন্ধু ললিতার বাবার বন্ধু। সেই সূত্রে প্রস্তাবের উত্থাপন। আমাকে নিশ্চয় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল।

আমি এক বন্ধুকে নিয়ে ললিতাকে 'দেখতেও' গিয়েছিলাম। বিশেষ কোনও বাক্যালাপ হয়নি আমাদের মধ্যে। তবু ললিতাকে আমার 'পছন্দ' হয়েছিল, আমাকে ললিতার। আমাদের বিবাহ সুখের ছিল, শান্তির। প্রেমের উত্তেজনা তাতে ছিল না, তার প্রয়োজনও বোধ করিনি। কোনও কিছুর অভাব মনে হয়নি বিবাহিত বছরগুলিতে, ললিতা অসুস্থ হয়ে পড়বার আগে।

রাজীব মাথুর ললিতার মৃত্যুর পর কোনও নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করেনি। দেহ ও মন অনেক সময় তাদের ক্ষুধা জানিয়েছে, রাজীব ক্ষুধাকে প্রশ্রয় দেননি, কাজের ভারে চেপে রেখেছে। সারাদিন কর্মপ্রবাহ টেনে নিয়ে গেছে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত, তারপর ক্লান্ত দেহে নিদ্রা আসতে দেরি হয়নি।

আশে-পাশে, চারদিকে স্ত্রীলোকের সমাগম আজকাল। আইন ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে মেয়েদের আকর্ষণ করছে। সুপ্রিম কোর্টেই বেশ কিছু নারী অ্যাডভোকেট। হাইকোর্ট, জিলা কোর্ট, তার নিম্নতর কোর্ট সব যোগ দিলে এই দিল্লীতেই শ তিনেক মহিলা এখন আইনজীবী।

মক্কেলদের মধ্যে বেশ কিছু মহিলা, তাদের মধ্যে মধ্যযৌবন কেউ কেউ। আদালত এখন মধ্যবিত্ত নারীদের টানছে। ডিভোর্স কেস করছে অনেক বিবাহিতা নারী। তাদের মধ্যে সুদর্শনারা একেবারে অনুপস্থিত নয়।

সিভিল লিবার্টিস আন্দোলনে সামিল অনেক শিক্ষিতা মধ্যবিত্ত আধুনিক নারী, তাদের মধ্যে বেশ কিছু যুবতী বা মধ্যযৌবনা। অনেকের সঙ্গে রাজীব মাথুরের বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

কিন্তু একজনও তার বান্ধবী হতে পারেনি।

কেন পারেনি! রাজীব ইদানীং এ প্রশ্ন করেছে নিজেকে।

যে-সব জবাব পেয়েছে তাদের বিশ্লেষণ করলে যে-জবাবটা সব চেয়ে সারবান মনে হয়েছে তা হল : মেয়েদের কি করে কাছে টানতে হয় তা আমার জানা নেই।

আমার সময়ও নেই।

আমার মনের আনাচে-কানাচে জমাট হয়ে আছে ছোট ছোট ভয়, সংশয় সন্দেহের অন্ধকার।

ললিতার আত্মা কি ভাববে যদি আমি এখন কোনও নারীর ঘনিষ্ঠ হতে চাই ?

ভাস্বতী কি পারবে সহজভাবে গ্রহণ করতে এক বিমাতাকে ? বাড়ীতে যদি কোনও স্ত্রীলোককে একা নিমন্ত্রণ করি, ভাস্বতী পারবে তাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে ?

সহকর্মীরা ঠাট্টা করবে, মুখরোচক গুজব রটাবে। আত্মীয়দের ভ্রূ হবে কুঞ্চিত।

আমি কি করে দাঁড়াব প্রার্থী হয়ে কোনও মহিলার সামনে ?

ছেলেবেলা থেকে না-গৃহে, না-বিদ্যালয়ে, না-কর্মস্থলে আমাকে কেউ শিখিয়েছে কি ভাবে কোনও অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে বান্ধবী-সম্ভাব্য-পত্নী সম্পর্কের পথ তৈরি করতে হয়। আমি ললিতাকে বিয়ে করেছি। ললিতার সঙ্গে বিয়ের আগে প্রেম করিনি। ঐ আর্টটা আমার আয়ত্তে নেই।

চেষ্টা করলে কোনও স্ত্রীলোককে বিছানায় আনা যায়। এ পদের প্রার্থীরা নিজেদের খুব একটা লুকিয়ে রাখে না। কিন্তু তাদের তো বিয়ে করে ধর্ম-পত্নীর আসনে বসান যায় না!

গত এক বছরে রাজীব মাথুর দুবার দুটি পাত্র-চাই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছিল। ছোট্ট একটি চিঠির খসড়া করতে যতটা সময় লেগেছিল তার চেয়ে কম সময়ে সে পারত জটিল কোনও মামলার ব্রীফ তৈরী করতে।

চিঠির খসড়া করতে গিয়ে যে প্রশ্নটা তাকে সবচেয়ে বড় ধাক্কা মেরেছিল তা হল ঃ সম্ভাব্য পত্নীর কাছে, এক অপরিচিত নারীর কাছে, আমার পরিচয় কি ? আমি কে ?

বিশিষ্ট আইনজীবী ?

বিত্তবান মধ্যবয়সী 'সার্থক' পুরুষ ?

বিপত্নীক জনৈক ব্যক্তি ?

একটি তীক্ষ্নবুদ্ধি সুদর্শন বালিকার পিতা ?

না-কি আমি শুধু রাজীব মাথুর, জনৈক পুরুষ, জীবনপথের জনৈক উৎসাহী যাত্রী ?

একই চিঠির খসড়া পাঠিয়েছিল দুই বক্স নম্বরে। চার মাসের ব্যবধানে।

প্রথম পাত্র-সন্ধানী প্রার্থীর তরফ থেকে চিঠি এসেছিল বেশ চটপট। চিঠির জবাবে চিঠি। তারপর ফোনে কথাবার্তা পাত্রীর পিতার সঙ্গে।

'আপনার বয়স কত ?'

'চুয়াল্লিশ। চিঠিতে তো জানিয়েছি।'

'একটি কন্যা আছে ?'

'হ্যাঁ। তাও লিখেছি।'

'স্ত্রী ক বছর মারা গেছেন ?'

'তিন বছর।'

'ক খানা বাড়ী আছে আপনার ?'

'একখানা।'

'বসন্তবিহারে ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি যথেষ্ট ধনবান ?'

'মোটামুটি।'

'সংসারে আর কে আছেন?'

'মা এবং বোন।'

'আপনার সঙ্গেই বাস করেন?'

'মা তাঁর নিজের বাড়িতে বাস করেন। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। সেও বাস করে তার নিজের বাড়িতে।'

'আপনার স্বভাব কি রকম?'

'ভাল।'

'আপনি কি মোটা, না শীর্ণ?'

'রাজীব এবার বলেছিল, 'দেখুন, আপনি আমাকে যে ভাবে জেরা করছেন মনে হচ্ছে আমি আপনার সামনে হয় এক আসামী, নয় বিবাদী পক্ষের সাক্ষী।'

'আমি মেয়ের বাবা। আমাকে সব দিক ভেবে-চিন্তে, সব জেনে-শুনে, তবে এগুতে হয়।'

'তা ঠিক।'

'আপনার জন্মপত্রিকা আছে?'

'হয়ত মার কাছে আছে। ওসবে আমার বিশ্বাস নেই।'

'আমাদের আছে। আপনার প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন। দ্বিতীয় স্ত্রী বেঁচে থাকবে কিনা দেখে নিতে হবে তো!'

'নিশ্চয়ই।'

'ও, হ্যাঁ, আপনার মাথায় কি টাক আছে? আমার মেয়ে টাক সহ্য করতে পারে না।'

রাজীব এবার নিজেই আক্রমণ শুরু করল:

'আপনি তো এত প্রশ্ন করলেন আমাকে। এবার আপনার মেয়ের কথা কিছু বলুন।'

'কি জানতে চান?'

'বয়স কত?'

'আঠাশ।'

'আসল বয়স কত?'

'তার মানে?'

'মেয়েদের তো দুটো বয়স থাকে। একটা আসল বয়স, অন্যটা বিয়ের বয়স।'

'আমার মেয়ের বয়স একটাই।'

'দেখতে কেমন?'

'সুশ্রী। না, বেশ সুন্দরী।'
'ওজন?'
'জানি না।'
'দৈর্ঘ্য?'
'খুব একটা লম্বা নয়।'
'তার মানে বেঁটে ও মোটা।'
'কি বললেন?'
'পড়াশোনা কত দূর?'
'বি. এ. পাশ করে সেক্রেটারিয়েল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে চাকরী করছে।'
'কোথায়?'
'দিল্লী প্রশাসনে।'
'কেরানি?'
'স্টেনোগ্রাফার।'
'ব্রার সাইজ কত?'
'তার মানে?'
'না, কিছু নয়। নমস্কার।'
'কবে দেখতে আসছেন আমার মেয়েকে!'
'দেখতে আসছি না। নমস্কার।'

॥ পনের ॥

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটা ভিন্ন ধরনের। পাত্র-চাই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এক বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলার জন্যে, যাঁর বয়স আটত্রিশ, তিনি নিঃসন্তান, এবং উচ্চশিক্ষিত: রাজীব মাথুরের পত্রের জবাবে মহিলা নিজেই ফোন করেছিলেন।

'আমি মিঃ রাজীব মাথুরের সঙ্গে কথা বলতে পারি কি?'

'আমিই রাজীব মাথুর।'

'ও! আমার নাম অলকা সচদেব। আমার বিজ্ঞাপনের জবাবে আপনার চিঠি আমি দুদিন হল পেয়েছি।'

মহিলার কণ্ঠস্বর একটু ভাঙ্গা। এবং বেশ মোটা। দুয়ে মিলে কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন সেক্স-অ্যাপীল।

'আপনি নিজে ফোন করেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ।'

'মিঃ মাথুর, আপনার নাম অনেকেই জানে। আমার কাছে আপনার স্বর অপরিচিত নয়।'

'শুনে সুখী হলাম।'

'টেলিফোনে আমি আর কিছু বলতে পারব না ঃ আমাদের দেখা হতে পারে কি ?'

'নিশ্চয়।'

'কবে, কখন ?'

'আসছে রবিবার ? আপনি খালি আছেন ?'

'আছি।'

'আপনার কাছে আমার গাড়ি পৌঁছে যাবে বিকেল ছটায়। আমরা মৌর্য-শেরাটনে এক কাপ কফি খেতে পারব এবং কথাবার্তা হতে পারবে।'

'আপনি নিজে এসে আমাকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত নন ?'

'নিশ্চয় প্রস্তুত। আমি নিজেই আসব।'

ঠিকানা ছিল পঞ্চশীল পার্ক! 'এস' ব্লক। বাড়িটা খুঁজে পেতে বিশেষ কষ্ট হল না। ছটার সময় রাজীব গাড়ি নিয়ে দাঁড়াল বাড়ির গেটে। মাঝারি সাইজের দোতলা বাড়ি। গেটের ডান পাশে শ্বেতপাথরের ফলকে ক্ষোদিত রয়েছে 'এম. আর. সালদানা।'

বাহাদুর সিং নেমে গিয়ে কলিং বেল টিপল।

একটা লোক, বাড়ির ভৃত্যই হবে, দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বলল, 'মেম সাব এক্ষুণি আসছেন।'

'এক্ষুণি' মানে দশ মিনিট।

যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর চেহারা দেখে রাজীব মাথুর স্তম্ভিত হয়ে গেল। এতখানি সৌন্দর্য ও এত বেশি অসৌন্দর্য একসঙ্গে এক নারীর মধ্যে আগে সে দেখেনি। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি—ভারতীয় মাপে লম্বাই বলতে হবে, এক ঝাঁক লালচে চুল বব্ করে ছাঁটা, চোখ দুটি টানা ও দীর্ঘ, সরু নাক, প্রশস্ত কপাল, ঢলান মুখখানার চিবুক কোমল, চিক্কণ। একটু মোটার দিকেই মহিলা, বিশেষ করে দেহের মধ্যভাগে। মুখখানা খুবই সুন্দর, অন্তত এককালে তাই ছিল, কিন্তু প্রসাধনের আতিশয্যে অন্তত রাজীব মাথুরের চোখে কুশ্রী। চোখের ওপরে গভীর ভাবে নীলের প্রলেপ, নকল আই-ল্যাশ্, গালে দগদগে লাল রং, ওষ্ঠাধরে দগদগে লাল লিপস্টিক। জড়োয়া নেকলেস্, ঝোলান বড় বড় ইয়ারিং, বাঁ হাতে জড়োয়া ব্রেসলেট। পরনে হলদে জমির ওপর সবুজ নক্সার মহীশূরে সিল্ক শাড়ি, চোলি খুবই সংক্ষিপ্ত, হাতে দামী ব্যাগ, আঙুলে তিনটি আংটি, তার মধ্যে দুটি হীরের। উঁচু-হিল দামি জুতো, মহিলা

যতটা লম্বা তার চেয়ে তাঁকে লম্বা দেখাচ্ছে।

রাজীব মাথুর গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'নমস্তে। আমি রাজীব মাথুর।'

মহিলা বললেন, 'আমি অলকা সচদেব। আপনাকে অপেক্ষা করতে হল, মাপ করবেন।'

বাহাদুর গাড়ীর দরজা খুলেই দাঁড়িয়েছিল। রাজীব অলকা সচদেবকে গাড়ীতে বসিয়ে অন্য দরজা দিয়ে ঢুকে তার পাশে বসল। বাহাদুরকে বলল, 'মৌর্য-শেরাটন'।

পথে, গাড়িতে বসে, কথাবার্তা এগোতে চাইল না।

অলকা সচদেব বলল সে রাজীব মাথুরের নাম খবরের কাগজে দেখেছে। অ্যাডভোকেট হিসেবে, এবং 'কমন কজে'র ব্যাপারেও।

'আপনার কি সিভিল লিবারটিস্ ব্যাপারে উৎসাহ আছে?'

'মামুলি। খবরের কাগজটা আমি পড়ি, অন্তত পড়বার চেষ্টা করি।'

'এ বাড়ীটা আপনার?'

'এটা আমার বাবার বাড়ি। আমার একটা বাড়ি আছে। এখানে নয়, বাঙ্গালোরে।'

'আপনি বাঙ্গালোরে থাকেন?'

অলকা সচদেব কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই নীরবতা ভেঙ্গে বলল, 'আমার বাবা গোয়ানিজ। মা ছিলেন পর্তুগীজ ঃ তাই আমার রং ফর্সা।'

রাজীব বলল, 'আপনার বাবার সঙ্গে আমাব নিজের পরিচয় নেই। আমি জানি তিনি ফরেন সার্ভিসে ছিলেন। টোকিও-তে ভারতবর্ষের অ্যামবাসাডর হবার পর অবসর নিয়েছেন।'

অলকা সচদেব শুধু বলল, 'মা বাবাকে ছেড়ে লিসবন চলে যান ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট গোয়া অধিকার করে নেবার পরই। বাবা তখন গোয়ার রাজধানী পানজিমে বাস করতেন। ইন্ডিয়ার সঙ্গে গোয়াকে সংযুক্ত করে দেবার জন্যে একটা ছোটখাট আন্দোলন তৈরি হয়েছিল। বাবা তার পুরোভাগে ছিলেন।'

রাজীব বলল, 'তাই বুঝি তাঁকে ফরেন্ সার্ভিসে নেওয়া হল?'

অলকা সচদেব বলল, 'আমার মার ভাষায়, 'বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার।'

রাজীব অলকা সচদেবের বাক্যটিতে কিছু তিক্ততা অনুভব করল।

'আপনি নিশ্চয় তা মনে করেননি!' বলল সাবধানে।

অলকা সচদেব প্রশ্নের জবাব দিল না। গাড়ি কিছুক্ষণ চলল তাদের নীরবতা নিয়ে।

এক সময় হঠাৎ অলকা সচদেব প্রশ্ন করল, 'মিঃ মাথুর, আপনি সাঁইবাবার শিষ্য ?'

রাজীব বলল, 'না। আমি কারুর শিষ্য নই।' একটু পরে, রসিকতা আনবার চেষ্টা করে, 'আমি শুধু আইনের শিষ্য।'

অলকা সচদেব বলল, 'সাঁইবাবা কি সাচ্চা, না ঝুটা ? আপনার কি মনে হয় ?'

রাজীব বলল, 'এ প্রশ্ন নিয়ে আদালতে আমাকে কোনও কেস্ করতে হয়নি। অতএব এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি।'

অলকা হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'ব্যাপারটা হালকা নয়, মিঃ মাথুর। সাঁইবাবার শিষ্যদের সংখ্যা নিশ্চয় এক কোটি হবে ! এমন কোনও শাঁসাল লোক দেখতে পাইনে আজকাল যিনি সাঁইবাবার শরণ নেন না। সরকারে হোক, ব্যবসা-বাণিজ্যে হোক, রাজনীতিতে হোক।'

রাজীব বলল, 'আমি মোটেই শাঁসাল লোক নই।'

গাড়ি মৌর্য-শেরাটন হোটেলের প্রবেশ দ্বার দিয়ে ঢুকে লাউঞ্জের সামনে দাঁড়াল। উর্দি পরা দারোয়ান তড়িঘড়ি গাড়ির দরজা খুলল। প্রথম বেরিয়ে এল অলকা সচদেব। পরে রাজীব মাথুর। দুজনেই উর্দি-পরা দারোয়ানের পরিচিত মুখ।

রাজীব অলকা সচদেবকে নিয়ে কফিরুমে ঢুকল। ওখানকার ম্যানেজারও দুজনকেই চেনে, বোঝা গেল, যদিও একজনেরও নাম জানে না। দুজনকেই নিয়ে তাদের পছন্দমত টেবিলে বসাল। মেনুকার্ড রাখল তাদের সামনে।

'কি খাবেন ?' রাজীবের প্রশ্ন।

মেনু কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে অলকা সচদেব বলল, 'কফি।'

'আর কিছু নয় ?'

'আচ্ছা, পাকোড়া।'

বেয়ারাকে অর্ডার দিয়ে দিল রাজীব।

অলকার মুখোমুখি বসে রাজীব কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। অলকার দেহ থেকে দামী বিদেশী পারফিউমের যে সৌরভটা ভেসে আসছে তার মধ্যে একটা মৃদু মাদকতা রয়েছে যেন। মুখোমুখি বসে রাজীবের মনে হল অলকার শরীর একটু বেশী অনাবৃত। পুরুষের চোখকে শাসনে রাখতে হয় ভদ্রতার সীমানার মধ্যে।

কফি আসবার আগেই রাজীব মাথুর বলল, 'আসুন, এবার কাজের কথা বলা যাক।'

অলকা সচদেব হঠাৎ পাথর হয়ে গেল।

'আপনি শুরু করবেন, না আমি ?'

অলকা সচদেবের মুখে কথা সরল না।

'তাহলে আমিই শুরু করি', বলল রাজীব মাথুর, 'আপনি কি ধরনের দ্বিতীয় স্বামী খুঁজছেন ?'

অলকা সচদেব আরও একটু সময় নিয়ে বলল, 'জানি না।'

'আপনি এই সাক্ষাৎকার প্রস্তাব করেছিলেন। নিশ্চয় আপনার কিছু বলবার, জানবার ছিল।'

অলকা সচদেব এবার মুখ খুলল।

'মিঃ মাথুর, আইনজীবী হিসেবে আপনার সুখ্যাতি আমার অজ্ঞাত নেই। আমি আপনার সঙ্গে বিবাহিত হবার জন্যে এ সাক্ষাৎকার চাইনি। চেয়েছি অন্য কারণে।'

'কি কারণ সেটা ?'

'আপনি আমার ওপর চটছেন। দোষ আপনার নয়। দেখুন, প্রথম সাক্ষাতেই আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের বিবাহিত হবার সম্ভাবনা নেই। আপনি আমাকে কিছুতেই বিয়ে করবেন না। গাড়ীতে বসেই আমি অনুভব করেছি আমার উপস্থিতি আপনার দেহ-মনে আকর্ষণ আনেনি, বিকর্ষণ এনেছে। আমিও আপনাকে বিয়ে করতে পারব না। আপনি আমার চেয়ে বেঁটে। আমি বেঁটে ও মোটা পুরুষকে পছন্দ করি না।'

ইতিমধ্যে কফি ও চীজ পাকোড়া এসে গিয়েছিল। দুজনে কফি পান করছিল, অথবা পানের ভান। পাকোড়া স্পর্শ করেনি।

রাজীব মাথুর বলল, 'তাহলে চলুন কফি পান শেষ করে বেরিয়ে যাই। আমার সময়ের দাম আছে।'

অলকা সচদেবের হাত মিনতি নিয়ে রাজীব মাথুরের হাত স্পর্শ করল। 'আপনি রেগে গেছেন, আর তার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আমি যা বলেছি তা ঠিক, আপনাকে মানতেই হবে। আপনি নিশ্চয় সম্ভাব্য পত্নী হিসেবে আমাকে পছন্দ করবেন না।'

'না কিন্তু এমন সহজ কঠিন ভাষায় তা আপনাকে জানিয়েও দেব না।'

'আপনার কাছে আমি অভদ্র। তাতে আমার আপসোস নেই। কিন্তু আমি সুবিধাবাদীও। আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'কি ?'

'আমার একজন খুব বড় অ্যাডভোকেট চাই।'

'কেন ?'

'আমার টাকার অভাব নেই। তাঁর ফীজ আমি দিতে পারব।'

'আপনি কি কোনও মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন ?'

'পড়ব।'

'কিসের মামলা ? ভূতপূর্ব স্বামীর সঙ্গে সম্পত্তির মামলা ?'

'না। খুনের মামলা।'

'খুনের ! কে কাকে খুন করেছে ?'

'আমি আমার আগের স্বামীকে খুন করব। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে ডিফেন্ড করবেন ?'

'মিসেস সচদেব, মামলা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আপনাকে আমার চেম্বারে আসতে হবে। এখন চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

পঞ্চশীল পার্ক পর্যন্ত যায়নি রাজীব মাথুর। বসন্ত বিহারে নিজের বাড়িতে নেমে গেছে। বাহাদুর সিং পৌঁছে দিয়েছে অলকা সচদেবকে তার বাবার বাড়িতে। পথে কোনও কথা হয়নি দুজনের। রাজীব বুঝতে পেরেছে। মহিলার মাথা পুরো ঠিক নেই। রাগ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও। জীবন মানুষের সঙ্গে কি বিচিত্র খেলাই না খেলে যায়। কখনও তার খেলায় প্রভাতের কোমল সূর্য, সায়াহ্নের স্নিগ্ধ মাধুর্য, রজনীর গভীর ঐশ্বর্য। আবার কখনও নিদাঘের ঝলসান উত্তাপ, তছনছ করা প্রভঞ্জনের প্রলাপ।

ডাক্তার ও আইনজীবীদের সদা-সর্বদা মানুষের দুর্বল ও কদর্য চেহারার সঙ্গে বোঝাপোড়া করতে হয়। কয়েকদিন অলকা সচদেবের ঘটনাটা রাজীবকে মাঝে-মধ্যে দু একটা খোঁচা দিয়েছে। তারপর গেছে মিলিয়ে। তার চিহ্নমাত্র যায়নি রেখে।

কিন্তু মাস তিনেক পরে রাজীব মাথুর বিষম আশ্চর্যের সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় অলকা সচদেবের সঙ্গে পুনরায় ধাক্কা খেয়েছে।

দক্ষিণ দিল্লীর পুলিশ অলকা সচদেব নামে একটি উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীকে গ্রেপ্তার করেছে তার ভূতপূর্ব স্বামী মহাদেব সচদেবকে হত্যা করার অভিযোগে। মহাদেব সচদেব একটা ইলেকট্রনিক কোম্পানীর মালিক, ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ারও। দু বছর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। অলকা সচদেব মহাদেবকে খুন করেছে নিউ দিল্লীর এক পাঁচতলা হোটেলে। পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। শুধু বলেছে, আমি আমার ভূতপূর্ব স্বামী মহাদেব সচদেবকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করেছি। পিস্তলটা মহাদেব সচদেবের হোটেল ঘরে পাওয়া গেছে। অলকা সচদেব পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে আর একটা কথাও বলেনি। শুধু বলেছে, আর যা বলবার আমি আদালতকে বলব। অথবা বলবে আমার উকিল।

কয়েকদিন রাজীব মাথুরের ভয়ে ভয়ে কেটেছিল।

কিন্তু কেউ তার চেম্বারে আসেনি অলকা সচদেবকে ডিফেন্ড করবার অনুরোধ নিয়ে।

॥ ষোল ॥

তেইশ বছর বয়স ছিল ললিতার যখন রাজীব মাথুরের পত্নী হয়ে সে জয়পুর থেকে দিল্লী চলে আসে। ললিতার দেহে একটি আলতো সৌন্দর্য ছিল, যাকে রাজীব কোনওদিন ভাষায় অনুবাদ করতে পারেনি। গোধূলির বর্ণ ছিল ললিতার. ঘনকৃষ্ণ চুল প্রগলভ স্রোতে নিতম্ব পর্যন্ত প্রবাহিত। বড় বড চোখ দুটিতে আলোর ঝলকানি নেই, আছে সন্ধ্যার হাতছানি। ললিতার নাক ছিল ছোট, গোলাকৃতি মুখের সঙ্গে বেমানান। কিন্তু দাঁত, ওষ্ঠাধর, চিবুক রচনা করেছিল একটি অপূর্ব ত্রিভুজ। নাকের উপর হীরের নাকছাবিটা সারা মুখের স্তিমিত সৌন্দর্যকে দিত একটু নরম ব্যঞ্জনা। নরম, ললিতার দেহে, মনে. চালচলনে, ব্যবহারে, কথাবার্তায় যা সবচেয়ে বেশি মূর্ত হয়ে উঠত, তা ছিল নরম।

রাজীবের মজবুত দেহের সঙ্গে একটি নরম লতার মত লেগে থাকত ললিতা যখন তাদের দেহ হত সংযুক্ত। ললিতার নিজের যেন কিছুই চাইবার ছিল না। যা পেত নরম বিনয়ে, ললিত লাবণ্যে, তা গ্রহণ করত। লজ্জা ও সরমের ঘোমটা পরে থাকত সর্বদা ললিতার কামনা।

চলত ধীরে, মন্থর গতিতে। চোখ তুলে চাইতেও যেন সময় লাগত ললিতার। খেত আস্তে আস্তে, সময় নিয়ে, প্রত্যেকটি গ্রাস পুরো চিবিয়ে। কথা বলত নরম সুরে, প্রতিটি শব্দ আলাদা উচ্চারণ করে।

কোনও কিছুতেই বড় রকমের উৎসাহ দেখাত না ললিতা। তার মধ্যে গতি ও আবেগ ছিল না, ছিল স্থিতি ও বিশ্রাম। হাসলে ললিতাকে খুব সুন্দর দেখাত, তবে হাসি ছিল অস্তগামী সূর্যের শেষ আভা। খলখল ঝরনার প্রবাহ তাতে ছিল না, ছিল নিস্তব্ধ নদীর শেষপ্রান্তে ডুবেযাওয়া সূর্যের শেষ রশ্মি।

রাজীব মাথুর, তার যুগের আর দশটি ভারতীয় যুবকের মতই, বিয়ের আগে নারীদেহ সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ছিল। কি ধরনের মেয়ে স্ত্রী হিসেবে তার কাম্য তার ধারণা গড়ে উঠতে পারেনি। সম্বন্ধ করে বিবাহের প্রধান উপাদান মেনে-নেওয়া। সাত-পা একসঙ্গে চলে যাকে গ্রহণ করা গেছে, সে বিধাতা ও ভাগ্যের দান, তাকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে মানিয়ে জীবন কাটান স্বামীর ধর্ম। তার স্ত্রী যে ললিতা না-হয়ে আর কেউ হতে পারত এবং আর কেউ হলে তার জীবন যে বেশি সুখী, উত্তেজিত, উদ্বেলিত হতে পারত এ চিন্তা প্রবেশই করতে পারেনি রাজীব মাথুরের মাথায়।

ললিতাকে নিয়ে সুখী ছিল রাজীব মাথুর। ললিতাকে ভালবেসেছিল। ললিতার ভালবাসা পেয়েও ছিল। ললিতা যে পুরোপুরি সুখী নয় তা ভাববার কোনও কারণ দেখা দেয়নি।

গর্ভবতী হবার পর ললিতাকে নিয়ে প্রথম দুশ্চিন্তার প্রয়োজন হল। ডাক্তার বলল, ললিতার প্রচণ্ড অ্যানিমিয়া, রক্তের অল্পতা ওর শরীরের প্রধান দোষ। বলল, ললিতা সন্তান পেটে রেখে প্রসব করতে পারবে কিনা নিশ্চয় করে বলা যায় না। যদি পারেও, দ্বিতীয়বার মা হওয়া তার পক্ষে একেবারে সমীচীন হবে না।

নিয়মিত আয়রন ট্যাবলেট, আয়রন টনিক, প্রচুর বিশ্রাম, ডাক্তারদের বেঁধে দেওয়া নিয়মকানুন কড়া শৃঙ্খলার সঙ্গে পালন ঃ এসবই করতে হয়েছিল ললিতার গর্ভে ভাস্বতীকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে, গর্ভ থেকে ভাস্বতীকে জীবিত অবস্থায় বার করে আনার জন্যে। ললিতার প্রাণ সংশয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভাস্বতীর জন্ম দিতে ও জন্মের পর; চিকিৎসকদের নিপুণতায় ও ঈশ্বরের করুণায় শেষ পর্যন্ত বেঁচে গিয়েছিল ললিতাও।

বছরের পর বছর রাজীব ললিতাকে গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে নিয়ে গেছে। রামদাস ও লছমী সর্বদা সাহায্য করেছে ললিতাকে সাংসারিক কাজে, যার মানে, ললিতাকে প্রায় কিছুই করতে হয়নি। অনবরত ডাক্তারের সতর্ক পাহারায় রয়েছে ললিতা। রাজীব মাথুরের কর্মজীবন প্রসারিত হয়েছে, আইনজীবীর জীবনে আদালতের বিজয় যে উত্তেজনা ও স্বার্থকতাবোধ এনে দেয় তার মাদকতা রাজীব আস্বাদ করতে পারছে। তবু তার মনের একটা অংশ ললিতাকে কখনও ছেড়ে চলে যেতে পারেনি, ক্রমশ দুর্বল, পাংশু স্ত্রীর ক্ষীয়মান দেহ ও ম্লান হয়ে-যাওয়া মুখ প্রায় সর্বদা তার সহচর হয়ে থেকেছে।

'আমি তোমাকে কোনও সুখ দিতে পারছি না,' বলেছে ললিতা রাত্রির আলিঙ্গনের মধ্যে।

'তুমি আছ এই আমার সুখ,' বলেছে রাজীব অকপট স্নেহে। 'তুমি আর ভাস্বতী।'

নিজেকে বঞ্চিত মনে হয়নি।

তার পর একদিন এল সেই আঘাত, যা রাজীব মাথুর কোনওদিন ভুলতে পারবে না। ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব দিল্লীর নামকরা ডাক্তারদের একজন। তিনিই ললিতার চিকিৎসক।

একদিন, সেদিনটা ছিল ৫ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার, ললিতাকে পরীক্ষা করে ডাঃ ভার্গব রাজীব মাথুরকে বললেন, 'আপনি আজ সন্ধ্যের সময় একবার আসবেন। একাই আসবেন।'

রাজীবের হৃৎপিণ্ড মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল।

'কিছু খারাপ মনে হচ্ছে!'

'সন্ধ্যেবেলা বলব।'

সন্ধ্যেবেলা বলতে রাত রাটটা হয়ে গেল। পুরো এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল রাজীবকে ডাঃ ভার্গবকে রোগীমুক্ত হবার জন্যে। যখন সে তাঁর মুখোমুখি বসল, তখন ডাঃ ভার্গবের সামনে ললিতার ফাইল।

'আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্চি, মিঃ মাথুর, যে আপনার স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ.' ঘোষণা করলেন ডাঃ ভার্গব।

এবার রাজীব অনেকখানি তৈরি ছিল দুঃসংবাদের জন্যে।

'কি হয়েছে ওর?'

গত সপ্তাহে যে সব টেস্ট ও এক্সরে করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে একটা ডায়াগনোসিসই সম্ভব। আপনার স্ত্রীর লিউকেমিয়া হয়েছে, মিঃ মাথুর।'

'মাই গড্!'

ফাইল খুলে রিপোর্টগুলির ওপর চোখ রেখে ডাঃ ভার্গব বলে গেলেন, সন্দেহ আমার অনেক দিন থেকেই হচ্ছিল। আগে আপনাকে বলিনি, বলে লাভ হত না। চিকিৎসা আমি বেশ কিছুদিন হল শুরু করেছি। কিন্তু রোগ বড় তাড়াতাড়ি চলেছে। মিসেস মাথুরের প্লীহা বড় বেশি বেড়ে গেছে। রক্তের সাদা ও লাল সেল এবং প্লেট্লেট্গুলি গুরুতর ভাবে অস্বাভাবিক। সাদা সেলগুলি বেড়ে এখন ৩০০,০০০-এ দাঁড়িয়েছে। হাড়ের মাসের মধ্যে যে সব গুঁড়ো গ্র্যানুলোসাইট্স্ থাকে সেগুলো এখন চলাচলমান রক্তের মধ্যে এসে গেছে। লাল সেলগুলির সংখ্যা খুব কমে গেছে। আমরা তিনটে ঘটনার ওপর নির্ভর করে লিউকেমিয়া ডায়াগ্নস্ করে থাকি। লিউকোসাইটোসিস, রক্তের মধ্যে অস্বাভাবিক গ্র্যানুলোসাইট্স্, হাড়ের মাসের মধ্যে মাইলয়েড হাইপারপ্লাসিয়া। তার সঙ্গে দেখতে হয় রোগীর অবিরাম রুগ্ণতা, রক্তাল্পতা এবং প্লীহার অবস্থা। আপনার স্ত্রীর শরীরের মধ্যে রক্তের সেলগুলি ফেটে রক্তক্ষয় হচ্ছে। কিছুদিন হল মাড়ি, ঠোঁট, আঙুলের নখ ফেটে যে রক্তক্ষয় দেখতে পাচ্ছেন সেটাও একটা বড় সংকেত। স্প্লীন্ এবং লিভার দুটোই বড় হয়ে গেছে। অতএব, আমার ডায়াগনসিস হচ্চে 'ক্রমিক মাইলোসিস্টিক লিউকেমিয়া'।'

রাজীব কথাগুলি শুনতে শুনতে পাথর হয়ে যাচ্ছিল। ডাঃ ভার্গব থামবার পরে প্রায় এক মিনিট তার মুখ দিয়ে কথা সরল না।

যখন রাজীব কথা বলল, মনে হল কথাগুলি তার নয়, পাশে দাঁড়িয়ে সব ব্যাপারটা দেখে জেনে, অন্য কারুর কণ্ঠ থেকে নির্গত।

'প্রগ্নোসিস ?'

ডাঃ ভার্গব বললেন, 'ঠিক বলা সম্ভব নয়। কোনও কোনও রোগী আট থেকে পনের বছর বেঁচে থাকে। তাদের সংখ্যা খুব কম। ডায়াগ্নোসিস হবার পর তিন বছরের বেশি রোগী সাধারণত বাঁচে না। এমন রোগী মাঝে মাঝে আমরা পাই যারা বেশ কিছুদিন স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। আমার ধারণা আপনার স্ত্রীর লিউকেমিয়া অনেক বছরের। গর্ভবতী হওয়া, সন্তানের জন্ম দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে নিচু-স্তরের লিউকেমিয়া নিয়েই। এখন রোগ বেড়েছে, তবে গতিও বেড়েছে। দুবছরের বেশি এঁকে রাখতে পারবেন বলে ভরসা দিতে পারছি না।'

রাজীব মাথুর বলল, 'চিকিৎসা ?'

'চিকিৎসা চলবে। আমি এখন রেডিয়েশন থেরাপি করব। মাইলোসিস্টিক লিউকেমিয়ার চিহ্নগুলি দূর করবার এটাই সব চেয়ে সফল উপায়। ব্লাড কাউন্ট কমিয়ে ২০,০০০-এ আনতে পারলে ভাল ফল পাওয়া যায়। সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ডাঃ শিবচরণ জৈন খুব ভাল রেডিওলজিস্ট। তাঁকে দিয়ে এক্সরেডিয়েশন করাতে হবে তাতে অনেক-বেড়ে-যাওয়া সেলগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। স্প্লীন ও লিভারের আয়তন ছোট হয়। হাড়মাসের মধ্যে অস্বাভাবিক সেলগুলি ধ্বংস হলে স্বাভাবিক রেড সেল তৈরি হতে পারে, তাতে রক্তাল্পতা কমে যায়।'

একটু থেমে ডাঃ ভার্গব আবার বললেন 'মিঃ মাথুর, আমি আমেরিকানদের নিয়ম অনুসরণ করি। যার রোগ তাকে অথবা তার নিকটতম আত্মীয়কে রোগীর অবস্থাটা খুলে বলা, ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া আমি উচিত বলে মনে করি। আমাদের দেশে নিয়ম অন্যরকম। ডাক্তাররা রোগীকে বা তার আত্মীয়কে যত কম বলে পারেন তাই ভাল মনে করেন। আজকাল ডাক্তারি বিদ্যা নতুন বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনেক এগিয়ে গেছে, অনেক বদলে গেছে। শিক্ষিত লোকেরাও এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি জানেন, জানতে চান। আমি মনে করি আপনার জানা প্রয়োজন যে আপনার স্ত্রীর দু তিন বছরের বেশি বাঁচবার সম্ভাবনা কম। এটা জানা থাকলে অনেক কিছু আপনার পক্ষে করা সম্ভব হবে যা করা দরকার, যা না-করতে পারলে আপনি পরে দুঃখ পাবেন।'

রাজীব বলল, 'আপনি ঠিক বলছেন। জানতে পারা আমার ভীষণ দরকার ছিল।'

ডাঃ ভার্গব বললেন, 'আপনাকে আমার আরও বলতে হচ্ছে যে রেডিয়াম চিকিৎসা খুব কষ্টকর। খুব বমি-বমি ভাব থাকবে, দেহে একটা বড় রকমের জ্বালা অনুভব করবেন। প্রতিবার চিকিৎসার আগে 'আর-৩৪' 'আর-৩৫'

দিয়ে এ সব উপসর্গের উপশম করানর চেষ্টা হবে। ডাঃ জৈন রেডিয়েশনের বদলে উরেক্ষেণ দেওয়া যেতে পারে কিনা নিশ্চয় বিচার করবেন, তবে আমার মনে হয় না তাতে কাজ হবে। মিঃ মাথুর, আপনাকে খুব ধৈর্য ও শক্তির সঙ্গে এই কঠিন পরীক্ষা সামলাতে হবে। আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব তা নিশ্চয় করব। কিন্তু ক্মাসের মধ্যেই রোগীর অবস্থা এমন জায়গায় এসে পড়বে যখন তাঁর কষ্ট লাঘব করাই আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে, রোগ তার মাশুল নিয়ে নেবে তাকে থামান যাবে না।'

'য়ুরোপ আমেরিকা নিয়ে গেলে ভাল হতে পারে?'

'আমি যখন থেকে মিসেস মাথুরের চিকিৎসা করছি তখন থেকেই এ প্রশ্ন আমার বার বার মনে এসেছে। চিকিৎসায় আমরা নিশ্চয় পশ্চিমী দেশগুলির মত অগ্রসর নই। কিন্তু আমি তো মেডিকেল জার্নালগুলি সর্বদা পড়ি, আমার জানা নেই লিউকেমিয়া চিকিৎসার উন্নত ব্যবস্থা কোথাও আছে কিনা। আপনি নিশ্চয় আপনার স্ত্রীকে বিদেশে নিয়ে যেতে পারেন চিকিৎসার জন্যে। আমার নিজের ধারণা, যে অবস্থায় তিনি পেঁীছেছেন তাতে বিশেষ লাভ হবে না। যদি আপনি আমেরিকায় নিয়ে যেতে চান আমি আপনাকে পুরো ক্লিনিক্যাল রিপোর্ট দিয়ে দেব, ডাক্তার ও হাসপাতালের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দিতে পারব।'

॥ সতের ॥

ডাঃ ভার্গবের চেম্বার থেকে সোজা বাড়ি যেতে পারল না রাজীব মাথুর। যে নারীর দু-তিন বছরের বেশি আয়ু নেই তার মুখোমুখি আমি হব কি করে? সে তো জানে না যে তার দিন ফুরিয়ে এসেছে, জানি শুধু আমি। জানেনা ভাস্বতী যে তাকে তিন বছরের মধ্যে মাতৃহীন হতে হবে। আমি একা একা এই ভীষণ জ্ঞান বয়ে বেড়াব কি করে? আমার চোখ, মুখ, কথা কি ওকে বলে দেবে না যে আমি জানি?

রাজীব সোজা চলে গেল সুপ্রিম কোর্টের প্রাঙ্গণে তার চেম্বারে। চেষ্টা করল একটা কেসের জটিল আইনের গাঁট খুলবার। বসল ফাইল নিয়ে, পুঁথিপত্র নিয়ে। মন দিতে পারল না। রাজীব মাথুর মদ্যপান করে না। কিন্তু চেম্বারে একটি 'বার' থাকে, রাখতে হয়, ছোট্ট 'বার', উচ্চবিত্ত মক্কেলদের জন্য। আজ নিজেই একটা ব্রাণ্ডি ঢেলে নিল, সঙ্গে ফ্রিজ থেকে বার করা বরফ। ব্রান্ডি পান করে মনটা কিছুটা হালকা হল। চেম্বার বন্ধ করে

বাড়িতে গিয়ে বসল রাজীব মাথুর।

ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভাস্বতীও, তার নিজের ঘরে।

খিদের নামটুকু নেই। তবু রামদাসের পীড়াপীড়িতে রাজীব একগ্লাস দুধ খেয়ে নিল।

শোবার ঘরে ঢুকে দেখল ললিতার দেহ লতিয়ে রয়েছে শয্যার বাঁ পাশে। তাকিয়ে রইল রাজীব। ললিতার মুখ পাংশু-মনে হচ্ছে একেবারে রক্তহীন। হাত পা বুক অসম্ভব ক্ষীণ হয়ে গেছে কয়েক মাসে। কিন্তু গাল দুখানি এখনও ভরপুর, চোখ তেমনি স্তিমিত-আলোয় আকর্ণ প্রসারিত। নাক, ওষ্ঠাধর, চিবুক মিলে ত্রিভুজটি তেমনি মনোরম। চুলগুলি কিন্তু আর তেমনি ঘনকৃষ্ণ নেই শুধু উঠে যায় নি, কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে।

দাঁড়িয়েই ছিল রাজীব ; খুব কম শক্তির আলোটা জ্বলছিল ললিতার মাথার পাশে ছোট টেবিলে।

হঠাৎ ললিতা চোখ খুলল। উঠতে চেষ্টা করে, থেমে গেল।

'তোমার এত দেরি হল যে ?'

'রাজীব বলল, 'কাজে আটকে গেলাম।'

'খেয়েছ ?'

'হ্যাঁ।'

'এবার শুয়ে পড়ো। বড় ধকল গেছে তোমার আজকে।'

বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল ললিতা। অন্তত রাজীবের মনে হল, সে প'ড়েছে ঘুমিয়ে।

পরের দিন সকাল বেলা প্রাতরাশের সময় রাজীব বলল, 'চল, আমরা কোথাও ঘুরে আসি কিছুদিনের জন্যে।'

ললিতা কমলালেবুর রস পান করছিল খুব আস্তে আস্তে।

'কোথায় ?'

'অনেক দূরে। বিদেশে!'

'বিদেশে কেন ?'

'তোমাকে নিয়ে তো বিদেশে যাই নি কখনও। আমার একটা সুযোগ এসেছে নিউ ইয়র্ক যাবার। ইনটারন্যাশনাল সিভিল লিবারটিস য়ুনিয়নের বার্ষিক সভায়। তোমাকে ও ভাস্বতীকে নিয়ে যাব ঠিক করেছি।'

'কবে ?'

'আসছে মাসে।'

'কদিনের জন্যে ?'

'মাস খানেক!'

ললিতা বলল, 'মক্কেলদের জন্যে আদালতে তোমাকে রোজ মিথ্যে বলতে হয়। কিন্তু আমার কাছে মিথ্যে বলার কায়দাটা তোমার শেখা হল না।'

'মিথ্যে! মিথ্যের কি দেখলে?'

'সিভিল লিবারটিস য়্যুনিয়নের সভার এখনও চার মাস দেরি। তুমি একদম ভুলে গেছ।'

'মোটেই ভুলি নি। আমরা চার মাস বেড়িয়ে বেড়িয়ে তারপর...'

'এই যে বললে এক মাসের জন্যে?'

'আমি উকিল, না তুমি? রাজীব চেষ্টা করে হাসল।'

ললিতা বলল, 'তুমি কাল সন্ধ্যেবেলা ডাঃ ভার্গবের কাছে গিয়েছিলে।'

রাজীব নিস্তব্ধ, নিষ্পন্দ।

'আমি জানি, ডাঃ ভার্গব তোমাকে কি বলেছেন। আমি আর বেশি দিন বাঁচব না, তাই না? তুমি এত তুখোড় উকিল, এত সব বোঝো, জান, এটুকু জান না যে আমি খুব ভাল করে জানি যে আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে? আমার শরীর প্রতিদিন আমাকে বলছে, আর পারছি না, তোকে আমি আর বইতে পারছি না। আমার আত্মাও আজকাল আমাকে বলছে, এই পচা ক্ষয়ে যাওয়া শরীরে আমি আর পারছি না থাকতে। বিদেশে আমাকে নিয়ে গিয়ে কি করবে? ভাল চিকিৎসা? আমি তো সব চিকিৎসার বাইরে চলে গেছি। বিদেশে গিয়ে আমার কিছু হবে না। তার চেয়ে এই আমার নিজের বাড়িতে, আমার নিজের ঘরে, আমার নিজের স্বামী ও সন্তানের কাছে আমাকে থাকতে দাও যতদিন আমি আছি, তোমার খুব কাছে আমাকে থাকতে দাও।'

সারা বিবাহিত জীবনেও ললিতা এতগুলো কথা একবারে বলে নি কখনও। কথা বলে চলবার মধ্যে তার হাত থেকে কমলালেবুর রস গ্লাসসহ টেবিলে গড়িয়ে পড়ল, তার দেহকে এলাতে দেখে রাজীব তড়িৎ গতিতে তাকে বাহুর মধ্যে নিয়ে নিল, কথাগুলি শেষ করল ললিতা রাজীবের বুকের মধ্যে, চোখের জলে সিক্ত করে, মৃদু কণ্ঠস্বরকে রোদনে রিক্ত করে।

॥ আঠার ॥

তার পরেও ললিতা তের মাস বেঁচে ছিল।

ধাপে ধাপে জীবন থেকে মৃত্যুর মুখে ধাপে ধাপে নেমে যাবার তের মাস।

তের মাস যা জীবন ও মৃত্যুকে ক্রমশ মুখোমুখি টেনে এনেছিল, অবশেষে জীবন মিলিয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর মহাশূন্যে, অথবা মহাপূর্ণে?

তের মাস ধরে রাজীব জীবন মৃত্যুর রহস্যময় দুশমনি ও মিতালি নিজের চোখে দেখেছিল, নিজের অন্তরে অনুভব করেছিল, তের মাসে তার অভিজ্ঞান প্রসারিত ও গভীর হয়েছিল, জীবনকে মৃত্যুর চশমা দিয়ে দেখতে পেলে যে অভিজ্ঞানের সন্ধান মেলে।

ললিতার প্রত্যেকটি ইচ্ছে পূর্ণ করার মধ্যে ছিল জীবনকে উপভোগ করবার আনন্দ।

'আমার ইচ্ছে করছে জয়পুরে গিয়ে বাপ-মার কাছে কদিন কাটিয়ে আসি।'

রাজীব ললিতা ও ভাস্বতীকে নিয়ে জয়পুরে গিয়েছিল। পুরো সাতদিন কাটিয়েছিল ওদের সঙ্গে, যা তার মত আইন-ব্যবসায়ীর পক্ষে আর্থিক ও পেশার দিক থেকে ক্ষতিকর।

ললিতা বলেছিল, আমার পুজো দিতে ইচ্ছে করছে বিড়লা মন্দিরে।

রাজীব পুজোর সব কিছু যোগাড় করে ললিতাকে বিড়লা মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল, পুজোর সময় উপস্থিত ছিল, ললিতাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তবে চেম্বারে গিয়েছিল। একটা বড় কেসের তারিখ পড়েছিল সেদিন, বিচারককে অনুরোধ করে তারিখ পিছিয়ে নিতে হয়েছিল, যে-ধরনের ব্যক্তিগত উপকারের অনুরোধ রাজীব করতে চায় না বিচারকদের কাছে, তাতে বিচারক-আইনজীবীর স্বাভাবিক সেকুলার সম্পর্ক, তার মতে, আহত হতে পারে।

ললিতা চেয়েছিল রাজীব যেন তাকে ছেড়ে বাইরে কোথাও গিয়ে একদিনের বেশি না থাকে।

'তোমার অনুপস্থিতিতে মরে যেতে আমার ভীষণ ভয় করবে; আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব না।'

রাজীব একদিনের জন্যে দিল্লীর বাইরে যায় নি তের মাস। তার নিজের মনেই ভয় ছিল ললিতা যে-কোনও দিন চলে যেতে পারে। সামনে দাঁড়িয়ে বিদায় না-দিতে পারলে আমার বড় ব্যথা লাগবে, সে ব্যথা তোমার ভয়ের চেয়ে কম গুরুতর নয়, ললিতা।

মৃত্যুর কথা যখন ললিতা বলত, রাজীব একবারও তাকে মিথ্যে আশ্বাস দেয় নি যে সে বেঁচে থাকবে, রোগ তার সেরে যাবে। ললিতা মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে শিখুক, এই ছিল তার ইচ্ছে, কারণ অপেক্ষা তো তাকে করতেই হবে। ললিতার সঙ্গে সঙ্গে রাজীব নিজেও মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে শিখেছিল। কে সেই অনাহূত অনিমন্ত্রিত ভীষণ অতিথি যে একদিন, যে কোনওদিন, নির্ঘাৎ এসে হাজির হবে, প্রাণের ছোট্ট শিশু পাখিটিকে বার করে নিয়ে যাবে এই রোগজীর্ণ দীর্ণশীর্ণ দেহ থেকে ? তার অপেক্ষায় থাকতে বুক কাঁপে, রক্তের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, হৃৎপিণ্ড হঠাৎ যায় থেমে, তবু কোথা থেকে উঠে আসে পরম এক উত্তেজনা, ঈশ্বরদর্শনের মতই মন-মাতোয়ারা।

রাজীব গীতার একাদশ অধ্যায় রোজ পড়ে শোনাত ললিতাকে। বার বার বলত, 'আমি মনে প্রাণে বুঝতে পারছি, তোমাকে এভাবে রোগজীর্ণ দেখে বুঝতে পারছি মৃত্যু কাউকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় না, যেতে পারে না, যে আছে, সে থেকে যায়, তার যাওয়া হয় না।'

ললিতা ভাস্বতীর ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশেষ কিছু বলত না। শুধু দুটো কথাই বার বার বলত।

'ভাস্বতী যেন তোমার মত হতে পারে।'

'ভাস্বতীকে আমি কিছুই দিতে পারি নি। তোমার কাছে যেন সব কিছু পেতে পারে।'

এক রাত্রিতে ললিতার অবস্থা বেশ খারাপ হল। ডাক্তার ভার্গব বললেন, এঁকে এখন কড়া সেডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে।

তার দরকার হল না।

ললিতা গভীর রাত্রে জ্ঞান হারাল। জ্ঞান আর তার ফিরল না। রাজীব জানতে পারল না মৃত্যু কখন এল, এসে দাঁড়াল ললিতার পাশে, ললিতাকে বিদায় দেবার অবকাশ তার হল না। তিন দিন কোমায় আচ্ছন্ন অজ্ঞান থেকে ললিতার দেহ এক-সময়ে নিষ্প্রাণ হয়ে গেল।

॥ উনিশ ॥

দিল্লী এসে প্রথম তিন মাস পারমিতার কেমন একটা ঘোরের মত কেটে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলসফি ডিপার্টমেন্ট থেকে সে এক বছরের ছুটি নিয়েছে, বেতনহীন ছুটি। নিজের ইনসিওরেনস পলিসির প্রাপ্য টাকা আদায় করবার অপেক্ষা করে নি, শুধু কোম্পানিকে নিকের মৃত্যুর খবর জানিয়ে লিখে রেখেছে এক বছর বাদ ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসে সে টাকাটা নিয়ে নেবে। পাখি কিছু মাসিক টাকা পাবে আঠার বছর না-হওয়া পর্যন্ত নিকের সোস্যাল সিকিউরিটি থেকে, সেক্ষেত্রেও পারমিতা শুধু পত্র মারফৎ দাবি জানিয়ে রেখেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপার্টমেন্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সাবলেট্ করে দিয়েছে এক বছরের জন্য আসবাবপত্র, টেলিভিশন, বাসনকোসন সব কিছু সহ। নিক ও তার নিজের গাড়ি দুটোই জলের দামে বিক্রি করে দিয়েছে।

আঠার বছর আগে পারমিতা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী-জীবন শেষ করে সম্মানজনক ফেলোশিপ পেয়ে নিউ ইয়র্ক চলে গিয়েছিল। নিকের সঙ্গে বিয়ে হবার পর পারমিতা মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিল। বাবাকে লিখেছিল, 'আমার নাগরিক ব্যক্তিত্বকে আমি দুভাগে বিভক্ত রাখতে চাই নে। নিক্ আমেরিকান; তার স্ত্রী হিসেবে আমাকেও আমেরিকান হতে হবে। নিক্ কোনওদিন ভারতবর্ষে গিয়ে বাস করবে না আমি আমেরিকান নাগরিক হতে অনিচ্ছুক হলে নিক্ সব সময় মনে মনে এক ভয় পোষণ করবে, হয়ত একদিন আমি ভারতবর্ষে ফিরে যাব তাকে ছেড়ে। এ সব 'শক্তিমান' দেশগুলির মানুষ কত যে দুর্বল তা তুমি ধারণা করতে পারবে না, বাবা।'

পারমিতার মনে হয়নি দেশে থেকে গিয়ে পাখিকে নিয়ে সে বেঁচে থাকতে পারে। দীর্ঘকাল আমেরিকায় বাস করে, আমেরিকান স্বামীর ঘর করে, তার ব্যক্তিত্বের আনাচ কানাচ যেমন বদলে গেছে, তেমনি বদলেছে মানসিকতা: কতগুলি প্রয়োজন জায়গা করে নিয়েছে তার মানসিকতায় যাদের বিশেষ কোনও অর্থ নেই ভারতীয় সমাজে। পারমিতা মানুষের জীবনের অনেক অদলবদল ঘাত-প্রতিঘাত দেখেছে, বুঝেছে যার সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষদের পরিচয় এখনও হয় পুঁথিগত নয়ত বহু-দূরস্থ।

দেশে আসবার সঙ্গে সঙ্গে যেটা পারমিতাকে সব চেয়ে বেশি ধাক্কা দিয়েছে তা হল ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়দের অভিভাবকত্ব। সে দেখতে পেল মাসিদের চোখে তার কোনও বৃদ্ধি ও পরিবর্তন ঘটে নি, সে আঠার বছর আগে যা ছিল

এখনও তাই আছে। মাসিরাই বিশেষ করে তাকে বোঝাতে চাইল আমেরিকায় ফিরে যাবার কোনও দরকার নেই, নিজের বাড়িতে দিল্লীতে পাখিকে নিয়ে জীবনযাপন করাই তার পক্ষে সব চেয়ে বুদ্ধির কাজ হবে। ছোটমাসি, যার সঙ্গে সম্পর্ক তার ছিল মায়ের মত নিকটতম এক সময়, বলল, একটা নিগ্রোকে বিয়ে করা তার খুব ভুল হয়েছে, যদিও ভাগ্য ভাল, পাখি মোটেই নিগ্রোর মত দেখতে হয় নি, বাঙ্গালি মেয়ে বলে পাখির পরিচয় মেনে নিতে কারুর বাধবে না।

পারমিতা বাবাকে বলল, 'এখানে সবাই ধরে নিয়েছে আমি কি করে জীবন কাটাব তা নির্ধারণ করে দেবার অধিকার তাদের।'

উৎপল মুখার্জি বললেন, 'তোমাকে ভালোবাসেন যারা তাঁরা সে ধরনের একটা দায়িত্ব বোধ করে থাকেন। এটা ভারতবর্ষ, আমেরিকা নয়।'

'কিন্তু আমার জীবন যে অন্য রকম হয়ে গেছে, এটা কি ওঁরা বুঝতে পারেন না?'

'ওঁরা মনে করেন তুমি সেই পুরান মিতাই রয়ে গেছ।'

'কৈ? তুমি তো একবারও বলো নি, বলছ না, কি ভাবে আমার এখন চলা উচিত।'

'আমি তোমাদের কোনওদিন বলি নি। সেজন্যে আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমার সুনাম নেই। তোমার মাও মাঝে মধ্যে বলত, আমি আর একটু পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তোমরা ভাইবোনেরা সম্ভবত দেশছাড়া হয়ে যেতে না।'

পারমিতা বলল, 'জানো, বাবা, আরও একটা ব্যাপার আমাকে ভীষণ আঘাত করেছে। মাসিরা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানে আমার মা কি চাইত, কি তার পছন্দ ছিল, না-ছিল!'

'তুমি দর্শনের অধ্যাপক, মিতা। বিশেষ করে তোমার জানা আছে, জীবন এক-তরফা নয়। তোমার মা ও মাসিদের পারস্পরিক জানাজানি আর তোমার মা ও তোমার পারস্পরিক জানাজানির মধ্যে প্রভেদ অনেক।'

'তা না হয় হল, কিন্তু এটা তো সবার জানা থাকা উচিত যে আমাদের বাবা-মা-ভাই-বোনদের মধ্যে সব কিছু চিরদিন খোলাখুলি থেকে গেছে, কেউ আমরা কারুর কাছে কিছু গোপন করি নি। মা যদি আমাকে উদার ভাবে নিক্-কে বিয়ে করতে সম্মতি না দিত, বিয়ে করা হয়ত আমার পক্ষে সম্ভবই হত না।'

'তোমার কোনও মাসি যদি দাবি করে যে তোমার মার মন সে তোমার চেয়ে বেশি বুঝত তুমি কি তা নিয়ে ঝগড়া করবে?'

'নিশ্চয় করব। আমার মাকে আমি যে ভাবে বুঝতাম সেটাই আমার

কাছে সব চেয়ে বড় বোঝা। মাসিদের মন নিয়ে আমার মাকে বুঝি নি কোনদিনও, বোঝা সম্ভবও হত না। মাসি, বিশেষ করে ছোটমাসি, আমার মা হতে চাইছে।'

'সে তো অনেক কাল তোমার মার মতই ছিল!'

'তখন আমি ছিলাম অন্য আমি। আমার মা শেষ দিন পর্যন্ত আমার জীবনের সমস্যা, সুখ দুঃখ, সফলতা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে। আমরা দুই প্রজন্মের নারী, তবু মার ক্ষমতা ছিল আধুনিক জীবনের সমস্যাগুলি বোঝবার। মাসিদের জীবন কেটেছে একেবারে অন্যধাঁচে। তাদের কোন ধারণাই নেই আমার জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে।'

'না থাকাই সম্ভব।'

'তবে তারা কেন আমাকে বলতে আসবে কি আমার করা উচিত না-উচিত?'

'স্নেহের একটা দাবি আছে তো!'

'আছে, আমি মানছি। কিন্তু সে দাবির দৌড় ততটুকু যতটুকু তার সঙ্গে দায়িত্ব রয়েছে। আমার জীবনের জন্যে দায়িত্ব নিতে তো কেউ এগিয়ে আসবে না!'

'এলেও তুমি দেবে না কাউকে। আমাকেও না।'

'তোমাকে দিয়েছি, দেবও। তোমার ঘাড়েই তো এসে জমা হয়েছি!'

'আমার ঘাড়ে নয়, মিতা। আমার বুকে।'

বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে পারমিতা। দিল্লীর বাড়িতে ফিরে এই প্রথম সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে।

'কি হয়েছে? তুমি কাঁদছ কেন? তুমি তো সহজে কাঁদো না, মিতা!'

পারমিতা এতক্ষণে আসল ব্যথাটা খুলে ধরতে পারল বাবার কাছে।

ছোটমাসি বলল, তোর এখন আর বিয়ে-টিয়ের দরকার নেই। একটা মেয়ে আছে তাকে নিয়ে জীবন কেটে যাবে। এখানে একটা কলেজে কাজও নিশ্চয় পেয়ে যাবি। তবে, হ্যাঁ, যদি সেক্স্ চাস, তাহলে বিয়ে করতে পারিস।'

উৎপল মুখার্জি হেসে উঠলেন।

'ছোটমাসির কাছে বিয়ের কথা উঠল কি করে?'

'বাবা, তুমি কথাটাকে হালকা করে দিও না! ওদের কি ধারণা মেয়েরা কেবল সেক্স্-এর জন্যেই বিয়ে করে? তা ছাড়া কি অন্য কোনও অভাব নেই, থাকতে পারে না, সে অভাব পূর্ণ করতে পারে কেবল প্রেম, প্রেমিক পুরুষ অথবা স্বামী? ওরা কি এটুকু জানে না যে সেক্স্-এর জন্যে আজকাল আমাদের সমাজের মেয়েদেরও বিয়ে করতে হয় না? ছোটমাসির কি বোঝবার ক্ষমতা নেই যে সেক্স চাইলে আমি তা বিয়ে না-করেও পেতে পারি? বিয়ে

সম্বন্ধে এমন একটা কুৎসিত ধারণা নিশ্চয় ছোটমাসি পোষণ করে না। তার কথার আঘাতটা আমার ওপর। আমার স্বামী মরে গেছে। সেক্স আমার কাছে এখন নিষিদ্ধ। তবু যদি নিষিদ্ধ জিনিসে আমার লোভ থাকে, তাহলেই আমি বিয়ের কথা ভাবতে পারি।'

একটু পরে শুকনো চোখে, সোজা গলায় পারমিতা বলল, 'বাবা, তোমার বার্নাড শ'-র ডকটরস্ ডিলেমা নাটকটার কথা মনে আছে?'

উৎপল মুখার্জি বললেন, 'নিশ্চয়। আমার অন্যতম প্রিয় বই ওটা।'

'নায়িকার নামটা ভুলে গেছি। তার স্বামী সৎলোক ছিল না। ছিল আর্টিস্ট। অতি সহজে লোকের কাছ থেকে টাকা পয়সা চেয়ে নিত। শোধ দেবার চেষ্টাও করত না। ক্ষমতাও ছিল না। কিন্তু ওদের বিবাহ ছিল পরম সুখের। মৃত্যুর আগে আর্টিস্ট স্বামী স্ত্রীকে কি বলেছিল মনে আছে, বাবা? বলেছিল, যার বিবাহ জীবন সুখের, তার বিবাহ ছাড়া চলতে পারে না জীবন। স্ত্রী মরে গেলে স্বামীকে সেই স্বভাব-সুখের সন্ধানে আবার বিয়ে করতে হবে, স্বামী মরে গেলে স্ত্রীকেও। জানো বাবা, আমারও আজকাল তাই মনে হয়। গত এক বছরে মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়েছে নিক্‌কে বুঝি আমি আর সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারছি না। নিক্ মরে যাবার পর প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছি আমাদের বিবাহিত জীবনে প্রেম কত গভীর ছিল, কত গভীর! ভাল না বেসে আমি বেঁচে থাকতে পারব না, বাবা।'

মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে উৎপল মুখার্জি বললেন, 'শুধু তোমারই ভালবাসার লোক চাই নে, মা, পাখির জন্যে চাই প্রিয় এক পিতা। পিতৃহীন হয়ে বড় হওয়া খুব বিপজ্জনক, তুমি তো জানই। মনের অনেকখানি ফাঁক থেকে যায়। তোমার শুধু ভালবাসার বন্ধু বা স্বামী হলে চলবে না, পাখিকে নিজের মেয়ের মত গ্রহণ করতে হবে তাকে।'

দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। উভয়ের মনের গভীরে একই প্রশ্ন: এমন কোনও পুরুষ কি আসবে পারমিতার জীবনে?

জীবন মৃত্যুর চেয়ে বড় শুধু তার মধ্যে প্রেম থাকার জন্যে। প্রেম কি পারমিতাকে দেখিয়ে দেবে জীবন সত্যি বড় মৃত্যুর চেয়ে?'

॥ কুড়ি ॥

উৎপল মুখার্জি একদিন পারমিতাকে বললেন, 'মিতা, আমার মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি এসেছে।'

পারমিতা পাখিকে ঘুম পাড়িয়ে সবে মাত্র ক্লান্ত দেহে টেলিভিসনের সামনে এসে বসেছে। একটা হিন্দী নাটক হচ্ছিল। উৎপল মুখার্জি অলস মনে তার কিছুটা দেখছিলেন।

মিতা বলল, 'এ তো তোমার সারাজীবনের অভ্যেস।'

'আমি একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাই।'

'কিসের বিজ্ঞাপন ?'

'তোর।'

'আমার ? আমার আবার বিজ্ঞাপন কিসের ? কি বলছ বুঝতে পারছি না, বাবা।'

'কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাই তোর নামে, পুরুষ-খোঁজা বিজ্ঞাপন।'

মিতা হেসে উঠল। 'ম্যাট্রিমনিয়াল মানে পুরুষ-খোঁজা ?'

'ম্যাট্রিমনিয়াল মানে বর-খোঁজা। তুমি বর খুঁজবে না। খুঁজবে উপযুক্ত পুরুষ।'

'এই দেশে ?'

'কেন নয় ? ৭৮ কোটি মানুষের মধ্যে ৩৫ থেকে ৫০ এর কোঠায় অন্তত পাঁচ কোটি পুরুষ রয়েছে। তার মধ্যে হাজার পাঁচেক নিশ্চয় অবিবাহিত নয় বিপত্নীক, নয় বিবাহ-বিচ্ছিন্ন। এত বড় পুরুষ বাজার আছে আর কোথাও পৃথিবীতে ?'

'তুমি দেখছি মার্কেট রিসার্চ করিয়ে নিয়েছ ?'

'আমার রিসার্চ আমি নিজেই করে নিয়েছি। বিজ্ঞাপনের খসড়াও করে রেখেছি। এখন তোমার অনুমোদন ও সম্মতির অপেক্ষা।'

'বিজ্ঞাপনের দড়িতে বেঁধে আনা পুরুষের সঙ্গে ভালবাসা হবে কি করে ?'

'বিজ্ঞাপনের দড়ি বিবাহের নয়, বন্ধুত্বের।'

'দেখি তোমার খসড়া ?'

উৎপল মুখার্জি তাঁর শোবার ঘর থেকে একটি একসারসাইজ বুক নিয়ে এলেন। এক খোলা পাতা রাখলেন পারমিতার চোখের সামনে।

খসড়া পড়ে পারমিতা হেসে অস্থির।

'বাবা, বাবা, আমার মিষ্টি বাবা, তুমি এ সব কি লিখে বসে আছ ?

'সম্ভবত সুন্দরী ?' 'সম্ভবত' কেন ? কেন 'নিশ্চিত' নয় ? বিচারের অধিকার পুরুষের ? 'জীবন আমার অতিশয় প্রিয়, আনন্দ আমার প্রধান পাথেয়।' বাবা, এসব কথার মানে বুঝবে এ দেশের মাঝ বয়সী পুরুষরা ? যাদের ভাগ্যে কেউ জোটে নি, অথবা দুর্ভাগ্যে বৌ ছুটে গেছে, কিম্বা সৌভাগ্যে বৌ গেছে মরে ? 'আনন্দ আমার প্রধান পাথেয়।' তুমি উপনিষদ পড়েছ মনে হচ্ছে নয়ত আমার কাছে যা শুনেছ তার কিছুটা মনে রেখেছ। মধ্যবয়সী ভারতীয় পুরুষরা 'আনন্দ' কথাটার মানেই জানে না, তারা শুধু সুখ ও সোয়াস্তি বোঝে, যার অর্থ টাকা-পয়সা, জমি, বাড়ি, এবং চিরকালের সেবিকা একটি স্ত্রী। 'নিরংকুশ বন্ধুত্ব ! সর্বনাশ ! চলন্তিকায়ও এই ধরনের কোনও শব্দ নেই, বাবা। তোমার কথার মানে বুঝবে না একজনও। বন্ধুত্ব 'সহজ স্বাভাবিক পথে বিবাহ বন্ধনে উত্তীর্ণ হলে।' মানে, বন্ধু হিসেবে আসবে, বেরুবে বর হয়ে ? এ ধরনের বিজ্ঞাপনে কেউ সাড়া দেবে না, বাবা।'

'না দিলে আমাদের ক্ষতি নেই। দিলে বেশ মজা হবে। তুমি ভারতবর্ষের উচ্চবিত্ত সমাজের মাঝবয়সী পত্নীহীন পুরুষদের সামাজিক চিত্র কিছুটা পেয়ে যাবে। দুচারজন বন্ধুত্ব-প্রার্থী পুরুষের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে তোমার হতেও-বা পারে। খেলা হিসেবে এটা কি একেবারে কৌতুকহীন ?'

পারমিতা বলল, 'কৌতুকহীন না-ও হতে পারে। কিন্তু, বাবা, একটা মজার খেলা আমার হাতে তুলে দেবার জন্যেই তুমি বিজ্ঞাপনটা তৈরি কর নি। তুমি আমার অহমিকায় সুড়সুড়ি দেবার রাস্তা খুঁজছ। দশ বিশ পঞ্চাশ একশ পুরুষের আবেদন আমার অহমিকাকে চাঙ্গা করে তুলবে, পুরুষদের প্রশংসক ও লোভী চোখ আমার আত্মবিশ্বাসকে বলিষ্ঠ করবে, এ ধরনের দুষ্টু চিন্তা তোমার মাথায় কিলবিল করছে।'

'যদি করেও থাকে তাতে তোমার আপত্তি আছে ?'

'তুমি আরও ভাবছ যে আমি এখানে খুব বোর্‌ড্ হচ্ছি, মাসিদের কথাবার্তা আমার মনোবলকে কমিয়ে দিচ্ছে, আমার ভবিষ্যৎ চেতনা ধূসর হয়ে আসছে। তুমি সবাইকে জানিয়ে দিতে চাইছ যে আমি এ সমাজের চলতি রীতি-নীতি মেনে চলব না, আমি চলব আমার নির্বাচিত পথে, কেননা আমার জীবনটা আর কারুর নয়, প্রধানত আমারই, আমিই ঠিক করব তার ভবিষ্যৎ রূপরেখাবর্ণ কি ধরনের হবে। বলো বাবা, সত্যি বলছি না ?'

উৎপল মুখার্জি বললেন, 'খুব একটা ভাল বলছ বলে তো মনে হচ্ছে না।'

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে পারমিতা বলল, 'কোন কাগজে বিজ্ঞাপনটা দিচ্ছ ?'

'সব বড় বড় কাগজে।'

'যাতে যে যেখানে আছে কারুর নজর না এড়ায় ?'

'শুধু নজর নয়। মনও।'

'আমি কি উত্তরের বন্যায় ভেসে যাব ?'

'অন্তত শ পাঁচেক জবাব তোমাকে পড়তে হবে, এটুকু নিশ্চিন্ত ভাবে বলতে পারি।'

'তাতে মোটামুটি মাস দুই কেটে যাবে, যাবে না ?'

'যদি কয়েকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে চাও তাহলে সময় কাটাবার সুবিধে হবে।'

'বিজ্ঞাপনের খরচ তোমার, না আমার ?'

'আমার।'

'বাজেটটা জানতে পারি কি ?'

'আপাতত পনেরশ' টাকা। পাঁচটা কাগজে এক রবিবারে বিজ্ঞাপন।'

'বেশ তো, বাবা। জীবন পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা।'

।। একুশ ।।

পারমিতার পাওয়া ১০৪ নম্বর পত্র ঃ

প্রিয় মহিলা,

আপনার প্রদত্ত বিজ্ঞাপনটি স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার পার্সোনাল কলমের মাথায় দাঁড়িয়ে আমার দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করল। আপনি সাধারণ জনৈক শিক্ষিত উচ্চবিত্ত স্ত্রীলোক নন, বিজ্ঞাপনের ভাষা তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়। এ ধরনের বিজ্ঞাপন আমাদের দেশের কন্যাদের অভিভাবকরা লেখেন না, কন্যারা নিজেরা এগিয়ে এসে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বিজ্ঞাপন করেন না। অতএব, আপনি অন্তত এক অর্থে অনন্যা।

কিন্তু আমি কেন আপনার বিজ্ঞাপনের সাড়া দিচ্ছি ? সাড়া দেবার আগে দুদিন ভেবেছি। আমার পরিচয়ের মধ্যে অনন্য কিছু নেই। আমি সুপ্রিম কোর্টে অ্যাডভোকেট, ব্যারিস্টার নই। আমি সিভিল লিবারটিস আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কিন্তু আপনি হয়ত ভারতবর্ষের এই আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নন। আমার বাড়ীর ঠিকানা আপনাকে বলে দেবে যে আমার অর্থের অভাব নেই।

আমি সম্বন্ধ করে অনেক বছর আগে বিয়ে করেছিলাম তার নাম ছিল ললিতা। প্রথম থেকেই সে রুগ্ন ও দুর্বল ছিল, পরে সেটা লিউকেমিয়ায় দাঁড়ায়. তিন বছর হল তার মৃত্যু হয়েছে। আমি ললিতাকে ভালবাসতাম, আর ললিতা ছিল স্বামীগত প্রাণ। আমাদের বিবাহ সুখকর, স্বস্তিপ্রদ ছিল।

আমাদের একটি মেয়ে আছে, তার নাম ভাস্বতী। সে আমার কাছেই বড় হচ্ছে।

বছর খানেক হল আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ বোধ করছি। কিন্তু পরিচয়ের মাধ্যমে বন্ধুত্ব করার মত মহিলা আমার চোখে পড়ে নি। আমার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে: এ বয়সে আবার সম্বন্ধ করে বিবাহ সম্ভব নয়। আমার জীবনে কর্মমুখরতা আছে, সার্থকতাও নেই তা নয়, আনন্দ আছে কিনা আপনার বিজ্ঞাপনটি পড়ার পর বার বার নিজেকে প্রশ্ন করেছি। উত্তর যা পেয়েছি তা খুব পজিটিভ নয়।

বলে রাখি, আমি সুপুরুষ নই। আমাকে দেখে আপনার মনে হতে পারে এ লোকটা বেঁটে-মোটা। আমার মন, হৃদয়, মস্তিষ্ক কিন্তু বেঁটে-মোটা নয়। আপনার মত মহিলাকে 'হ্যান্ডল্' করা আমার পক্ষে সহজ হবে না। এর মাঝে দুবার আমি বৈবাহিক বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছি, দুটো অভিজ্ঞতাই তিক্ত। ভেবেছিলাম আর সাড়া দেব না। কিন্তু আপনার বিজ্ঞাপন এক অজানা-অচেনা প্রাণ-চেতনার জীবন-বিলাসের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। ভাষার বাণীটি শুধু মার্জনীয় নয়, সংক্রামকও বটে।

আপনি যদি আমার সঙ্গে যোগাযোগ না করেন, আমার কোনও ক্ষোভ থাকবে না। আপনার সন্ধান সফল হোক। জীবনে আপনি আনন্দ খুঁজছেন। মানুষ মানুষকে আনন্দ দিতে পারে কিনা আমার জানা নেই। তাই আপনার সন্ধানকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

রাজীব মাথুর।